বিপ্লবী যতীন দাস

সম্পাদনা শেখ রফিক

মিকতাহুর রহমান চৌধুরী



বিপ্লবী যতীন দাস

সম্পাদনা

শেখ রফিক

বিপ্লবীদের কথা

বিপ্লবী যতীন দাস

প্রকাশক
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন নিচতলা
(কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
সেল: ০১৭২৬-১২৩৫৫০, rafiqcpb@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
মেহেদী বানু মিতা

মেকআপ
বিপ্লবীদের কথা

বর্ণ বিন্যাস ও বানান শুদ্ধিকরণ
বিপ্লবীদের কথা

ছেপেছেন
মাটি ও মানুষ, ১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

বাঁধাই
রবিন অ্যান্ড ছোঁয়া বুক বাউন্ডিং, ২৪৫/এ ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-90788-3-8

মূল্য: দুইশত বিশ টাকা

অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/biplobiderkotha

উৎসর্গ

জেল-অনশনে আত্মদানকারী বিপ্লবী
ও
খাপড়াওয়ার্ডের বিপ্লবীদের স্মরণে



যতীন দাস: জিনিসটা কি!

ভগৎ সিং: চাই একটু নতুন ধরনের বোমা, যা মারাত্মক শব্দে ফেটে পড়বে, কিন্তু কারো কোন দৈহিক ক্ষতি করবে না।

যতীন দাস: মানে! ক্ষতিই যদি না হল, তাহলে শুধু শুধু একটা নিরামিষ বোমা তৈরি করে লাভ কি?

ভগৎ সিং: লাভ–ঐ শব্দটা। এমন মারাত্মক শব্দ চাই, যার প্রচণ্ডতায় শুধু দিল্লী বা লাহোর নয়, গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

যতীন দাস: বেশ তাই হবে। হাসলেন যতীন দাস, এ আর এমন কি শক্ত কাজ। দিল্লী থেকে আগ্রার গুপ্ত আস্তানায়।



যতীন দাস

ভূমিকা

অনশন এক অদ্ভূত সংগ্রাম। শরীরধর্মের ঠিক বিপরীত জিনিস। শরীর রক্ষার বদলে স্বেচ্ছায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। হঠাৎ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়ার চাইতে অনেক বেশি সাহস, মানসিক দৃঢ়তা ও প্রস্তুতি চাই এর জন্য। দিনের পর দিন আহার থেকে বঞ্চিত হয়ে শরীরের কোষসমূহ শুকিয়ে আসবে, জীবনীশক্তি হয়ে আসবে স্তিমিত, নিষ্প্রভ। নিজে সচেতনভাবে সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে হবে তবেই হয়তো জীবন মৃত্যুর সীমান্তস্থলে পৌঁছে সে সাফল্য অর্জন করা যাবে।

– সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী কমরেড যতীন দাস রাজবন্দীদের মর্যাদার দাবিতে ৬৩ দিন অনশন করে জীবন দিয়েছিলেন। এই জীবনদান শুধু রাজবন্দীদের কিছু অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতার চেতনায় জাগ্রত করা।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, ঠিক দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে নিজেই নিজের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন বিপ্লবী যতীন দাস।এই কথা শোনামাত্র গোটা দেশের মানুষচেনতার তন্দ্রা-কারফিউ ভেঙ্গে অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মতউচ্চারণ করল ‘যতীন দাস জিন্দাবাদ’।

“উচ্চারিত হল করিব অমর বাণী–

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই–

নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।”

‘বিপ্লবী যতীন দাস’ বইটি যতীন দাস সম্পর্কে কয়েকজন লেখকের স্মৃতিচারণমূলক লেখা নিয়ে সংকলন করা হয়েছে। এ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বানানরীতি ওই সমস্ত লেখকের লেখা অনুসারে রাখা হয়েছে।

সতর্কতা সত্ত্বেওমুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। সচেতন পাঠক কোনো ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

শেখ রফিক
০৩ডিসেম্বর ২০১৩
ইকুরিয়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

যতীন দাস

কাজী নজরুল ইসলাম

আসিল শরৎ সৌরাশ্বিন, দেবদেবী যবে ঘুমাযে রয়
পাষাণ-স্বর্গ হিমালয়-চূড়ে শুভ্র মৌলি তুষারময়।
ধরার অশ্রু–সাত সাগরের লোনা জল উঠি’ রাত্রিদিন
ধোঁয়াইয়া ওঠে স্বর্গের পানে, অভিমানে জমে’ হয় তুহিন।
পাষাণ স্বর্গ, পাষাণ দেবতা, কোথা দুর্গতি-নাশিনী মা,
বলির রক্তে রাঙিয়া উঠেছে যুগে যুগে দশ দিক-সীমা।
খড়ের মাটির দুর্গা গড়িয়া দুর্গে বন্দী পূজারী-দল
করে অভিনয়! দেবী-বিগ্রহ জড় গতিহীন চির-অচল।
দেবতা ঘুমায়, ঘুমায় মানুষ, এরি মাঝে নিজ তপোবলে
জোর করে’ নেয় দেবতার বর দৈত্য-দানব দলে দলে।
মোরা পূজা করি, পূজা-শেষে চাই পায়ের পদ্ম শুভ-আশিস্,
ওরা চেয়ে নেয় কালীর খড়্গ, ভিষ্ণুর গদা, শিবের বিষ।
তপস্যা নাই, ঢাক ঢোল পিটে’ দেবতা জাগাতে করি পূজা,
দশ-প্রহরণ-ধারিণী এল না দশ শ’ বছরে দশ-ভুজা।...

এমনি শরৎ সৌরাশ্বিনে অকাল-বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল লঙ্কেশ্বরে বধিতে ত্রেতায় রামাবতার,
আজিও আমরা সে দেবীপূজার অভিনয় ক’রে চলিয়াছি,
লঙ্কা-সায়রী রাবণ মোদেরে ধরিয়া গলায় দেয় কাছি!
দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া হয়ত কাছিতে পড়ে ঝুলে’,
দেবীর আসন তেমনি অটল, শুধু নিমেষের তরে দুলে।
বলি দিয়া মোরা পূজেছি দেবীরে নব-ভারতের পূজারী-দল
গিয়াছিনু ভুলি’–দেবীরে জাগাতে দিতে হয় আঁখি-নীলোৎপল।

মহিষ-অসুর-মর্দিনী মা গো, জাগ্ এইবার খড়ুগ ধর।
দিয়াছি "যতীনে" অঞ্জলি—নব-ভারতের আঁখি-ইন্দীবর।

টুটে তপস্যা, ওঠে জাগি' ঐ পূজা-রত অভিনব ভারত,
ভারত-সিন্ধু গর্জি' উঠিল নিযুত শঙ্খ-মন্ত্রবৎ।
"উলু উলু" বোলে পুরনারী, দোলে হিম-কৈলাশ টাল্মাটাল,
কারাগারে টুটে অর্গল, ওঠে রাঙিয়া আশার পূর্ব-ভাল।
ছুটে বিমুক্ত-পিঞ্জর, পায়ে লুটে শৃঙ্খল ছিন্ন ঐ,
নাছে ভৈরব, ভৈরবী নাচে ছিন্নমস্তা তাথৈ থৈ।
আকাশে আকাশে বৃংহতি-নাদ করে কোটি মেঘ ঐরাবত,
সাগর শুষিয়া ছিটাইছে বারি, ও কি ফুল হানে পুষ্পরথ!
এ কি এ শ্মশান-উল্লাস, নাচে ধূর্জটি-শিরে ভাগীরথী,
অকূল তিমিরে সহসা ভাতিল নব-উদীচির নব-জ্যোতি।
বিস্ময়ে আঁখি মেলিয়া চাহিনু, দেখা যায় শুধু দেবী-চরণ,
মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শিব যে চরণ-তলে মাগে মরণ!
ভৈরব নাচে ঊর্ধ্বে, নিম্নে খণ্ডিত শির মহিষাসুর,
দুলিছে রক্ত-সিক্ত খড়ুগ, কাঁপিছে তরাসে অসুর-পুর।
চীৎকারি' ওঠে উল্লাসে নব-ভারতের নব-পূজারীদল,
"চাই না মা তোর শুভদ আশিস্, চাই শুধু ঐ চরণ-তল—
যে চরণে তোর বাহন সিংহ, মহিষ-অসুর মথিয়া যাস্।
যদি বর দিস্, দিয়ে যা বরদা, দিয়ে যা শক্তি দৈত্য-ত্রাস।"

শুধু দেখা যায় দেবীর রক্ত-চরণ, খড়ুগ, মহিষাসুর,—
ওকে ও চরণ-নিম্নে মুঘায় সমর-শয়নে বিজয়ী শূর?
কে যতী-ইন্দ্র তরুণ তাপস দিয়া গেলে তুমি এ কি এ দান?
শবে শবে গেলে প্রাণ সঞ্চারি'—কেশব, বিলায়ে তোমার প্রাণ!
তিলে তিলে ক্ষয় করি' আপনারে তিলোত্তমারে সৃজিলে, হায়!
সুন্দ ও উপসুন্দ অসুর বিনাশিতে তব তপ-প্রভায়!

হাতে ছিল তব চক্র ও গদা, গ্রহণ করনি হেলায়, বীর!
বুকে ছিল প্রাণ, তাই দিয়ে রণ জিনে গেলে প্রাণহীন জাতির।
তোমার হাতের শ্বেত-শতদল, শুভ্র মহাপ্রাণ তোমার,
দিয়া গেলে তব জাতিরে আশিস্, তোমার হাতের নমস্কার!

লইবে কে বীর উন্নত-শির দেবতার দান সে শতদল,
টলিয়া উঠেছে বিস্ময়ে ত্রাসে বিন্ধ্য হইতে হিম-অচল।
নামিয়া আসিল এতদিনে বুঝি হিম-গিরি হ'তে পাষাণী মা,
কে জানে কাহার রক্তে রাঙিয়া উঠিতেছে দশ-দিক-সীমা!

দেখালে মায়ের রক্ত-চরণ, কে দেখাবে দেবী-মূর্তি মা'র,
ভারত চাহিয়া আছে তার পানে, কে করিবে প্রতি-নমস্কার!

['যতীন দাস' কবিতাটি ১৯৩০ সালে কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রলয় শিখা' কাব্যগন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩১ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ এবং ১৫৩-এ ধারা অনুসারে এ কাব্যগ্রন্থটি নিষিদ্ধ করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী।]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরদধীচি শহীদ

যতীন্দ্রনাথ দাস

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়ে

আমি যুগে যুগে আসি। আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু,

এই স্রষ্টার শনি হাঁকাল ধূমকেতু।

যে বিপ্লবী বীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে সংযোজিত করে গেছেন এক নতুন অধ্যায়, যিনি বিপ্লবের চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে যুক্ত করেছিলেন অগ্নিপরিশুদ্ধ আবেগ, লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ধীর অথচ নির্ভীক পদক্ষেপে মৃত্যুর মুখে ধাবিতহওয়ার কালে যাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল– "আমি পলাশির প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই", বিশ্ব ইতিহাসে যিনি বীর শহীদ ম্যাকসুইনির সমগোত্রীয় হিসেবে নন্দিত (আয়ারল্যাণ্ডের ম্যাকসুইনির ৭৬ দিন অনশনের পর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়েছিল), এই ত্যাগের শুভ্র ও বৈরাগ্যে গৈরিক বাংলা মায়ের দামাল ছেলেই তো ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দধীচি – যতীন্দ্রনাথ দাস।

জন্ম ও পরিবার পরিচিতি

শ্রদ্ধেয় কিরণচন্দ্র দাসআমায় নিজ মুখে যা বলেছিলেন তাই বলছি। যতীন দাসের জন্ম হয়েছিল ১৯০৪ সালের ২৭ অক্টোবর উত্তর কলকাতার শিকদার বাগান অঞ্চলে মামার বাড়িতে। তাঁরা সব মিলিয়ে দশ ভাই-বোন ছিলেন। তবে প্রথম সাত জন অকালেই প্রয়াত হন। জীবিত তিনজনের মধ্যে যতীন দাস ছিলেন অষ্টম। একমাত্র বোন লাবণ্যপ্রভা ছিলেন নবম। আর কিরণচন্দ্র ছিলেন দশম। দেশপ্রেম ও বিপ্লবের বীজ ছিল তাঁদের পরিবারের রক্তে। পিতামহ মহেন্দ্রনাথ দাস জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাস স্বদেশি আন্দোলনের সময় ইংরেজের গোলামি করবেন না বলে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থায়ী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একটা স্টেশনারি দোকান খুলে সংসার চালাতে গিয়ে আজীবন দারিদ্র্য ও দুঃখের সঙ্গে

লড়াই করে গেছেন। চাকরি ছাড়ার পেছনের একটা অপমানজনক ঘটনার কথাও শ্রদ্ধেয় কিরণবাবু আমায় বলেছিলেন। ১৯০১ সালের দশহারার দিনে বিঙ্কমবাবু সপরিবারে গঙ্গাস্নান করে একটা ফিটন গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে (রেড রোডে) কয়েকটি ব্রিটিশ টমি তাঁদের জোর করে ওই গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজেরা গাড়িটি চেপে চলে যায়। বঙ্কিমবাবুকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হল। ওই দিনই উনি শপথ নেন সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেবেন।

১৯২১ সালে যতীন ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে আই. এ. পরীক্ষাতেও প্রথম ডিভিশান পান। তারপর ১৯২৩ সালে বঙ্গবাসী কলেজের থার্ড ইয়ার বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান। কিন্তু উত্তরোত্তর রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ায় ফাইনাল বি. এ. পরীক্ষায় বসার সুযোগই হয় না। তবে বঙ্গবাসীর ছাত্রদরদি অধ্যক্ষ আচার্য গিরীশচন্দ্র বসু যতীনকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রতি বছরই তাকে কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে ভর্তি করে রাখতেন (১৯২৩ থেকে ১৯২৮)। কারণ সেই সময় ভর্তির ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষদের দারুণ স্বাধীনতা ছিল। যখন যতীন কলেজে উপস্থিত থাকতেন তখুনি কলেজ-জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে একেবারেই একাত্ম হয়ে যেতেন। কলেজ ফুটবল টিমের হয়ে নিয়মিত খেলতেন। কলেজ টিম খেলায় জিতলে অথবা তিনি নিজে গোল করতে পারলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য এক এক বোতল Vimto-র (তখনকার দিনের Thums up বা Limca) জন্য বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের কাছে আব্দার করতেন। ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এমনি ভোজনবিলাসী মানুষ ছিলেন যে পকেটে পয়সা থাকলে বন্ধুদের নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকতেন। ভাবলে অবাক হতে হয় যে এমন এক ভোজনবিলাসী মানুষকেও মিরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরণ অনশনের পথই বেছে নিতে হয়েছিল কোন্ মন্ত্র বলে? তা হল ‘দেশপ্রেম’ যা বিপ্লবীকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দেয় না যে, “সবার আগে দেশের স্বাধীনতা–তারপর অন্য কথা।” বঙ্গবাসী কলেজের ম্যাগাজিন ও অন্যান্য নথিপত্রে দেখা যায় যে বাবা–বঙ্কিমবিহারী দাস ও তাঁর দুই পুত্র – যতীন্দ্রনাথ দাস ও কিরণচন্দ্র দাস–তিনজনেই ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজেরই ছাত্র।

কিশোর বিপ্লবী

কিশোর বিপ্লবী হিসেবেই যতীন্দ্রনাথ দাসের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৯-২০ সালে মাত্র ১৫-১৬ বছর বয়সে একটা বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। বিচারে তাঁর ছয় মাসের জেল হয়। কিন্তু জেলে তাঁকে অখ্যাদ-কুখাদ্য খেতে দেওয়ায় কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। শেষপর্যন্ত ডাক্তারের নির্দেশে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অতি অল্প বয়স থেকেই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মেলামেশা করায় বাবা (বঙ্কিমবাবু) যতীনকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। তিনিও দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস অফিসে আশ্রয় নেন। আবার বাবার কথায় কিছুদিন পরে বাড়ি ফিরেও আসেন। এই সময় দেবেন বসু নামে এক দক্ষ বিপ্লবীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। দেবেন বসুই শচীন সান্যালের সঙ্গে যতীন দাসের ঘনিষ্ঠতা করে দেন। এই সময় যতীনের ছদ্মনাম হয় – ‘রবিন’। আরে কিছুদিন গেলে যতীন দাস আর একটু সিনিয়র হলে তাঁর দ্বিতীয় নাম হয় ‘কালীবাবু’। শচীন সান্যাল সিনিয়র ও জুনিয়র সব বিপ্লবীদের নিয়ে বোমা বানানোর ট্রেনিং ক্লাস শুরু করেন। তাতে যতীন সবচেয়ে সফল ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। ঠিক হয় কলকাতায় বোমা বানানোর প্রধান কারখানা খোলা হবে। তারপর প্রয়োজন মতো দেশের সব প্রান্তে বোমা বানানোর কারিগরদের পাঠানো হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায় বোমা বানানোর একটা গোপন কারখানা স্থাপন করা হয়।

বোমার দোকান ও H.S.R.A

১৯২৪ সালে শচীন সান্যাল ভারতের সব প্রান্তের বিপ্লবীদের এক ছাতার তলায় আনার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন, যার নাম দেন – Hindustan Socialist Republican Assoication (প্রথমে নাম ছিল Army, পরে বদল করে নাম করা হয় Association)। তাছাড়া প্রয়োজনীয় পিস্তলের সমস্যা মেটাতে খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে যতীনের সক্রিয়তায় এবং বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ্র, দেওঘরের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন লহিড়ী, পাঞ্জাবের ইন্দার সিং নারায়ণ ইত্যাদি উগ্রবাদী বন্ধুদের সহায়তায় একটি পিস্তল ও বোমার গোপন দোকান গড়ে ওঠে। টাকার অভাব মেটাতে টালিগঞ্জ রোডের দক্ষিণে Indo-Burma Petroleum নামে পেট্রল স্টেশনের টাকা ব্যাংকে জমা দিতে পাঠানো হলে সেই টাকা ডাকাতি করে নেওয়া হয়। কিন্তু ১৯২৪-এর ৯ অগাস্ট বিখ্যাত

কাকোরি রেল স্টেশনের ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ ইন্দুভূষণ মিত্র ও বেনারসীলাল রাজসাক্ষী হয়ে যাওয়ায় পুলিশ আগে থেকেই সব কিছু জেনে ফেলে।

দক্ষিণেশ্বরের গোপন কারখানা

দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতিপাড়ায় যতীন বোমা তৈরির উন্নত প্রণালী শেখাতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও ট্রেনিং দিতেন। কারণ তখন যতীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন বোমা তৈরির দক্ষ কারিগর। উদ্দেশ্য একটি কেন্দ্রীয় অস্ত্র ও বোমা সরবরাহ কেন্দ্র গড়ে তোলা – সেখান থেকে সব প্রান্তের বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা সরবরাহ করা যায়। ১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর পুলিশ দক্ষিণেশ্বরের বাড়িটি ঘিরে ফেলে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ওই সময় বাড়িতে না থাকায় পুলিশতাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর পুলিশ গিরীশ মুখার্জী রোডের বাড়ি থেকে তাঁকে (যতীন্দ্রনাথকে) গ্রেপ্তার করে। একটা মজার ব্যাপার হল সীক্ষারা কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। তবুও ব্রিটিশ শাসকরা Bengal Ordinance প্রয়োগ করে তাঁকে আটক করে রাখে। মেদিনীপুরের এক condemned cell-এ তাঁকে রাখা হয়। ওই সময় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। তখন জেল-ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে ময়মনসিং জেলে পাঠানো হয়। এখানে স্বদেশি বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলতে দেখে তিনি জেল-সুপারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করে দেন। অবশেষে গোয়েন্দা বিভাগের D.I.G. লোম্যানের হস্তক্ষেপে একুশ দিনের দিন অনশন ভঙ্গ হয়। তারপরই তাঁকে পাঞ্জাবের মরু-অঞ্চলের দুর্গম ও ভয়াবহ মিয়ানওয়ালি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালের অগাস্ট মাসে যতীন্দ্রনাথকে কলকাতায় এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠিক ওই সময়েই তাঁর একমাত্র ভগ্নী লাবণ্যপ্রভাদেবীরও মৃত্যু হয়।

১৯২২-২৫ এই সময়টায় জাতীয় কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, আর ঠিক এই সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ। আবার ওই সময়েই যতীন দাস শৃঙ্খলপরায়ণ কর্মী ও মানুষ হিসেবে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। উন্নতমানের বোমা তৈরি, দল সংগঠন, পিস্তল ছোড়ায় এবং সামরিক কায়দায় দলের সদস্যদের পরিচালনায় তাঁর (যতীন্দ্রনাথের) একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের ৪৪-তম অধিবেশনের সময় ও তারপর যতীন দাস

Bengal Volunteers কোরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ওই সংগঠনে যতীন ছিলেন Major। শোনা যায় যে ওই সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। প্রত্যেককে সামরিক পদ্ধতিতে ড্রিল, মার্চ পাস্ট, অভিবাদন ইত্যাদি করানো হত। আর এই ব্যাপারে যতীন দাস বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি সে সময় South Calcutta National School-এর অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ছাত্রদের ড্রিল (Drill) শেখাতেন। কথাগুলি সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যতীন দাস সম্পর্কে লিখে গেছেন তাঁর Indian Struggle বইটিতে।

১৯২২-২৩ অর্থাৎ দেশবন্ধুর সময়ে বিপ্লবীদের কংগ্রেসের ভেতর থেকে কাজ করার কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ১৯২৮ থেকে অর্থাৎ সাইমন কমিশনবিরোধী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য দেখা দেয়। জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী সদস্যদের অবস্থান শক্ত করতে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরু Indian Independence League বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যতীন দাস সুভাষচন্দ্রের পথই শ্রেষ্ঠ পথ বিবেচনা করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘকেই সমর্থন জানান। তাছাড়াও ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের চুয়াল্লিশতম অধিবেশনে সভাপতি বরণে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর (Major) হিসেবে সবাইকে মুগ্ধ করে দেন যতীন।

যতীন দাস ও ভগৎ সিং

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্য ভগৎ সিং, ভগবতী চরণ শুক্লা এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেন। এই সময় ভগৎ সিং পাঞ্জাবে হিন্দ নওজোয়ান সভা নামে একটি বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের ফল হিসেবেই পুলিশি নির্যাতন ও লাঠিচার্জ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। ফলে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় নিহত হন। পাঞ্জাব কেশরীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিং পাঞ্জাবের পুলিশ প্রধান মি. স্কটের সহকারী মি.সন্ডার্সকে হত্যা করে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। কলকাতায় এসে দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে মেস খুঁজে বের করে যতীন দাসের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর তাঁকে (যতীনকে) অনুরোধ করেন ভগৎ সিং-এর নওজোয়ান সভার জন্য যেন কিছু করেন। ভগৎ সিং-এর কথায় ও আগ্রহে খুশি হয়ে যতীন দাস বলেন – ‘বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমার যা করণীয় ও

দেবার তা আমি উজাড় করে দিয়েছি স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের পায়ে। তবে তোমার মতো মহান বিপ্লবীর জন্যও একটা কাজ আমায় অবশ্যই করতে হবে। তা হল আগ্রায় গিয়ে তোমার দলের ছেলেদেরও বোমা বানানোতে অত্যন্ত দক্ষ করে দিয়ে আসতে হবে।" কথাবার্তায় দু'জনেই বেশ খুশি হন এবং সে রাত্রে ভগৎ সিং যতীন দাসের দক্ষিণ কলকাতার মেসে রাত্রিবাস করেন। এর কিছুদিন পরে যতীন দাস আগ্রায় গিয়ে ভগৎ সিং-এর দলের ছেলেদের বোমা বানানোর কাজে ভালো রকম ট্রেনিং দিয়ে এসেছিলেন।

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সভ্যদের আসনের পাশেই হঠাৎ একটি শক্তিশালী বোমা ফাটান ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। বিচারে তাঁরা দুজনেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে ভারতব্যাপী এক বিশাল পরিকল্পনা আছে সন্দেহ করে তদানীন্তত ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মি. প্যাট্রি (Mr. Pattry) নিজে পুনরায় তদন্ত শুরু করেন। এর ফলে ত্রিশটি নামের একটি তালিকা বেরিয়ে আসে। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন যতীন দাস। কালবিলম্ব না করে Lahore Conspiracy Case-এর অন্যতম অভিযুক্ত আসামি হিসেবে কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথ থেকে যতীন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৪ জুন ১৯২৯ তারিখে। এক্ষেত্রে তাঁকে ধরিয়ে দেয় ফণী ঘোষ নামে ভগৎ সিং-এর দলের প্রাক্তন এক সদস্য যিনি যতীন দাসের কাছে বোমা বানানো শিখতে আগ্রায় গিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের বোরস্টাল জেলে যতীন দাসকে কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ তখুনি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বটুকেশ্বর দত্তকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে এবং ভগৎ সিংকে পাঞ্জাবের ভয়াবহ মরু-কারাগার মিয়ানওয়ারি জেলে বন্দি করে রাখা হল।

২৫ জুন তারিখে যতীন ও তাঁর ১৫ জন সহযোদ্ধাকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হয়। ওই সহযোদ্ধাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন – অজয় কুমার ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, কৃষ্ণকুমার, রাজগুরু প্রমুখেরা। বটুকেশ্বর দত্তকে আগেই লাহোর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল। এঁরা সকলেই ছিলেন বিখ্যাত হিন্দুস্তান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। বলাবাহুল্য, বিশ ও ত্রিশের দশকে ওই H.S.R.A. অত্যন্ত বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে ব্রিটিশ শাসকদের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে ভগৎ সিংকেও লাহোর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয় পয়লা জুলাই ১৯২৯ সালে।

ঠিক পরের দিনই দোসরা জুলাই যতীন গোপনে বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, এখানে তাঁদের ওপর যে অমানুষিক পুলিশি নির্যাতন চলছে তার প্রতিবাদে তাঁরা ১৬ জন সমবেত ভাবে অনশন (GroupHungerStrike) শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেননা, গত বছর (১৯২৮) সেপ্টেম্বর মাসে দলের বার্ষিক গোপন অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ভবিষ্যতে অমানুষিক পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে দলের বন্দি সদস্যরা সমবেতভাবে অনশন করতে পারবেন। শোনামাত্র বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং ওই সমবেত অনশনে সামিল হবার জন্য আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত ৬ জুলাই আর একদফা গোপন বৈঠকের পর ১৩ জুলাই থেকে সমবেত অনশন (GroupHungerStrike) শুরু করার সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয় এবং ওই দিনই বড়োলাট লর্ড আরউইনকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

১৩ জুলাই, ১৯২৯ (রবিবার) থেকে সমবেত অনশন (Group Hunger Strike) যথারীতি শুরু হয়। ওই অনশন আরম্ভ করার ঠিক দু-এক দিন আগে যতীন তাঁর সহযোদ্ধাদের অঙ্গীকার করিয়ে নেন যে, তাঁদের দাবিগুলোর যথাযথ মীমাংসা হয়ে গেলে তাঁরা অবশ্যই অনশন ভঙ্গ করবেন। তবে যতীন্দ্রনাথ করবেন না। কেননা, তাঁর পক্ষে এই অনশনই হবে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের এক অভাবনীয় সুযোগ। ছেলেবেলা থেকেই তিনি একটি স্বপ্ন লালন করে আসছেন মনে মনে। তা হল পলাশির প্রান্তরে বাঙালি মিরজাফরকৃত বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করা। সহযোদ্ধাদের তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর পিতা বঙ্কিমবিহারী দাসের অনুমতি আগেই তাঁর পাওয়া হয়ে গেছে।

১৩/৭/১৯২৯ থেকে ১৯/৭/১৯২৯ – সাতটি দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। আট দিনের দিন (২০ জুলাই তারিখে) ভোরবেলা জেল-সুপার জেল-ডাক্তার ও আটজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট পাঠানকে সঙ্গে নিয়ে যতীনের সেলে প্রবেশ করলেন। তারপর কোন রকম সংকেত না দিয়েই ওই আটজন পাঠান একই সঙ্গে আট দিন অভুক্ত ও বিশেষ দুর্বল যতীনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যতীন মাটিতে লুটিয় পড়লেন। দুজন পাঠান তখন যতীনের বুকের ওপর চেপে বসে, আর অন্য ছয়জন চার পাশ থেকে যতীনকে জাপটে ধরে রাখে। ওই সুযোগে ডাক্তার একটা সরু নল যতীনের নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দুধ ঢালতে শুরু করে দেন। আর কোনো উপায় না দেখে যতীন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে

জোরে জোরে কাশতে থাকেন। ফলে ওই নলটির মুখ খাদ্যনালী থেকে সরে গিয়ে শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুকে যায় এবং কিছুটা দুধও যতীনের ফুসফুসে ঢুকে যাওয়ায় যতীন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ডাক্তার কোন কিছু চিন্তা না করেই মুহূর্তে একটা মোটা নল যতীনের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দুধ ঢালতে গিয়েলক্ষ করেন যে যতীনেরমুখ থেকে স্রোতের মত রক্ত বেরিয়ে আসছে। তখন ভয় পেয়ে তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর ডাক্তার ও জেল-সুপার ওই আটজন পাঠানকে সঙ্গে নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

৪৮ ঘণ্টা পরে (২২ জুলাই, ১৯২৯) যতীনের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলতেই তিনি লক্ষ করেন যে তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য তাঁর সেল-ভর্তি ঘরে নানা ধরনের খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আরও বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তাছাড়াও লক্ষ করলেন যে তাঁর পাশে রাখা হয়েছে সদ্য কেনা একটা শ্লেট ও একটা পেন্সিল। বুঝতে বাকি রইল না যে জীবনে আর কথা কইতে পারবেন না বলেই এখন থেকে সব কিছু ওই শ্লেটে লিখে জানাতে হবে। ওই দিনই সন্ধেবেলা (২২/৭/১৯২৯) ছোটোভাই কিরণ দাসও এসে হাজির। বলাবাহুল্য, যতীনের ওই সঙ্গিন অবস্থা উপলব্ধি করে স্বয়ং বড়োলাট লর্ড আরউইন তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বলে যতীনকে দেখা-শোনা করার জন্যই কিরণ দাসকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আনিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং ৬৩ দিনের ওই ঐতিহাসিক অনশনের ৫৩ দিনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে রইলেন স্বয়ং ছোটো ভাই কিরণ দাস। আর আমার এই প্রতিবেদন কিরণ চন্দ্রেরই ডায়েরির সংক্ষিপ্ত অনুলিপি মাত্র।

জুলাই শেষ, অগাস্টেরও একটা সপ্তাহ অতিক্রান্ত। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ প্রতিবাদে মুখর ও উত্তাল। ৭-ই অগাস্ট জাতীয় কংগ্রেস মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এক নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করল। তাছাড়াও জওহরলাল নেহরু যাতে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে ওই ১৮ জন অনশনকারী দেশপ্রেমিকদের স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন তার জন্যও অনুমতি চাওয়া হয়।

অনুমতি পেয়ে জওহরলাল নেহরু স্বয়ং ১০ আগস্ট লাহোর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে ১৮ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আসেন। নেহরুজির আত্মজীবনীতে লেখা আছে যে, ওই একমাসের অনশনে সকলেই অত্যন্ত দুর্বল এবং কেউ কেউ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর (নেহরুজির) পক্ষে

তাঁদের (অনশনকারী) সঙ্গে বিশেষ আলাপ-আলোচনার তেমন সুযোগ হয়নি। তবে তারই মধ্যে তিনি যতীন দাসের ও ভগৎ সিং-এর সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১১ আগস্ট (১৯২৯) বড়োলাট লর্ড আরউইন এক বিশেষ জরুরি ঘোষণায় অনশনকারীদের দাবিদাওয়া সব মেনে নিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে জেল অনুসন্ধান কমিটি স্থাপনেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে ১২ আগস্ট (৩১ দিনের দিন) যতীনের ১৭ জন সহ-যোদ্ধা অনশন প্রত্যাহার করে নেন। শুরু হয় অগ্নিযুগের এক অবিস্মরণীয় রক্তেরাঙা অধ্যায়। পরাধীন ভারতের নবীন-দধীচি যতীনের নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলার ইতিহাস। যতীন্দ্রনাথ একাই চালিয়ে যান পলাশির প্রান্তরে মিরজাফরকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এ যেন অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় তো বটেই। চলতে লাগল তাঁর একার অনশন লাহোর সেন্ট্রাল জেলে। কবির ভাষায়—

যদি তোর ডাক শুনে কউ না আসে, তবে একলা চলো রে,

আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়েএকলা জ্বলো রে।

অগাস্টও যায় যায়। শরীর সব দিক থেকেই ভেঙে পড়েছে – পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন যতীন একটু একটু করে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আগুনটা ঠিকই জ্বলছে – “মিরজাফরের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে” – “ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ”।

প্রতিদিন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করেন – রিপোর্ট লিখে রাখেন। শিয়রে বসে ছোটোভাই কিরণ দাস সব কিছু লক্ষ করেন আর নিজের ডায়রিতে টুকে রাখেন। তাঁর তো কিছু করার নেই। কারণ প্রথম দিন থেকেই তো কিরণের হাত-পা বাঁধা। কেননা প্রথম দিনই কিরণ বড়ো ভাইয়ের সেলে প্রবেশ করা মাত্রই যতীন ছোটো ভাইকে গীতা হাতে শপথ করিয়ে নেন যে, যতীন অসহ্য যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে পড়লেও যেন কিরণচন্দ্র ভুলেও যতীনকে এক ফোঁটা জলও দিয়ে না বসেন।

৪৩ দিনের দিন (২৪ অগাস্ট) যতীনের ডান চোখটা (Right Eye) কেমন যেন গলে গেল। ৪৮ দিনের দিন (২৯ আগস্ট) বাঁ-চোখটাও (Left Eye), আগেই তো আটদিনের দিন (২০/৭/২৯) জেল ডাক্তার নল দিয়ে জোর করে দুধ খাওয়াতে গিয়ে যতীনের কথা বলার ক্ষমতা চিরদিনের মতো নষ্ট করে দিয়েছেন।

৫০ দিনের দিন (৩১ অগাস্ট) দেখা গেল যে, পক্ষাঘাত তাঁর সমস্ত শরীর গ্রাস করে ফেলেছে। যখন ওই পক্ষাঘাত যতীনের হৃৎযন্ত্রকে স্পর্শ করবে তখুনি তাঁর হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এতো দিনে টনক নড়ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। কিন্তু তবুও শাসকরা যতীন্দ্রকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে রাজি নয়। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাস ও ছোটো ভাই কিরণচন্দ্র ঘৃণাভরে জামিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর এক সর্বজননিন্দিত গুপ্তচরের জামিনে যতীনকে মুক্ত করা হয় পঞ্চান্ন দিনের দিন (৫/৯/২৯)। পরের দিন (৬/৯/২৯) একেবারে কাক-ভোরে ডাক্তার ও জেল-সুপার অ্যাম্বুলেন্স ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে জেলে প্রবেশ করে দেখেন যে যতীনের সহ-যোদ্ধারা তার সেলের চারপাশে ব্যারিকেড রচনা করে পথ অবরোধ করে শুয়ে আছে। তখন ডাক্তার জেল-সুপারকে বোঝান যে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যান্তর নেই। কেননা জোর করে যতীনকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার চেষ্টা করলেই উত্তেজনায় যতীনের হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

পরের সাতদিন (৭/৯/২৯ থেকে ১৩/৯/২৯) হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের মানুষ দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এল শেষের সেই ভয়ংকর দিনটা – শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তারিখে ঠিক দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে অমর বিপ্লবী যতীন দাস চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যতীন্দ্রনাথের আত্মাহুতির কথা শোনামাত্র গোটা দেশের মানুষ অপার শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছিল। ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে এক নতুন ধারা সংযোজিত হল। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল ‘যতীন্দ্রনাথ দাস জিন্দাবাদ’ ধ্বনিতে। কোটি কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হল – হে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর তোমায় শতকোটি প্রণাম। আরও উচ্চারিত হল কবির অমর বাণী–

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই–

নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

লাহোর থেকে যতীনের মরদেহ হাওড়া পৌঁছতে তিন-দিন লেগেছিল। কারণ প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই শ্রদ্ধাবনত দেশবাসী ট্রেন থামিয়ে ওই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। শবাধার গ্রহণ করতে হাওড়ায় উপস্থিত ছিলেন – সুভাষচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও শ্রীমতী কমলা নেহরু প্রমুখেরা। সরকারি হিসেবেই পাঁচ লক্ষ

মানুষ হাওড়া থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত শবানুগমন করেছিলেন। খবরটা শোনামাত্র ক্ষোভে ও দুঃখে মর্মাহত কবি রাত্রি জেগেই লিখে ফেলেছিলেন–

সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ–

হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহো।

পরের দিন পিতা– বঙ্কিমবিহারী দাস একটি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডের ম্যাকসুইনি পরিবারের কাছ থেকে। তাতে লেখা ছিল–

> "We are proud of yourson Jatindra Nath. India would now be free".

তথ্যসূত্র

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসের পাতা থেকে- প্রথম খণ্ড' বইয়ের ১৪৫ – ১৫৩পৃষ্ঠা থেকে নেয়া।

প্রকাশক: মিত্রম্, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০০৮।

বিপ্লবী যতীন দাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১৯২৮ সনের শেষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিগ্‌দেশাগত বিপ্লবীদের যে মিলন ঘটে এবং কংগ্রেসের তোষণ নীতিতে যে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি এবং একান্ত বাধ্য হয়ে যে তাদের নিজেদের মনোমত পথকে বেছে নিয়ে তারা দেশকে স্বাধীন করবার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে মৃত্যুপণে অগ্রসর হয়েছিল তারই প্রথম আত্মপ্রকাশ দেখা গেল ১৯২৯ সনের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর আইন-পরিষদ (অ্যাসেম্‌ব্লি) ভবনে প্রচণ্ড বোমার বিস্ফোরণে। পরিষদ ভবনে পরিষদেরা তখন Public Safety Bill আলোচনায় ব্যস্ত, সহসা যেন তারই প্রতিবাদকল্পে প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হলো।

কারো প্রাণহানি হলো না বটে তবে কয়েকজন আহত হলেন সামান্য।

হত্যার প্রচেষ্টা ও বিস্ফোরক আইনের বলে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত শ্বেতাঙ্গ সরকারদের হাতে ধৃত হয়ে তাদের সুবিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো।

কেমন করে না জানি ডালকুত্তার দল ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে পরের দিনই অর্থাৎ ৯ই এপ্রিল লাহোরের কাশ্মিরী বিল্ডিং অকস্মাৎ ঘেরাও ও খানাতল্লাসী করে বহু পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য হস্তগত তো করলই এবং শুকদেব ও কিশোরীলাল প্রভৃতি কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তারও করল।

আবার ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে এক মীরজাফর এগিয়ে এলো তার পূর্বপুরুষের ঋণশোধ করতে – যার ফলে, তার স্বীকারোক্তিতে শ্বেতাঙ্গ সরকার আবার বিরাটভাবে খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় করে অসীম উদ্যমে আর এক নতুন মামলার পত্তন করলে ঃ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিংকে নতুন করে টেনে এনে আবার অদ্ভূত করিৎকর্মা, চক্রী শ্বেতাঙ্গ সরকার উক্ত মামলার অন্যতম দোষী সাব্যস্তে আদালতে দাঁড় করাল।

নতুন করে সকলের সঙ্গে আবার ঐ দু'জনেরও বিচার প্রহসন শুরু হলো। ইংরাজের আইনে, ইংরাজের আদালতে, ইংরাজের পদাশ্রিত বিচারকদের

নিয়ে। বাংলার দধীচি যতীন দাসও এসে দাঁড়াল ধৃত হয়ে ঐ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত।

হয়ত বা গল্পকথা বা নিছকই কল্পনা কাহিনী, কবে কোন অতীত যুগে অসুরতাড়িত স্বর্গভ্রষ্ঠ হৃতসর্বস্ব লাঞ্ছিত দেবতার দলকে মুক্তি-অস্ত্র বজ্র নির্মাণের জন্য দধীচি মুনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে তাঁর অস্থিদান করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র সেই মৃত্যু বজ্র হেনে অসুরকুলকে ধ্বংক করে স্বীয় জন্মভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার এক তরুণ যুবকও ভারতের এক যুগসন্ধিক্ষণে তিল তিল করে সুদীর্ঘ ৬৩তম দিন ধরে দেশের মুক্তিযজ্ঞে প্রাণনির্যাসটুকু নিংড়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। ভারতের ম্যাক্‌সুইনী, ভারতের দধীচি প্রণাম তোমায়।

১৯০৪ সালে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস বঙ্কিমবিহারী দাসের ঘরে জন্মগ্রহন করে।

স্কুলের ছাত্রজীবন উত্তীর্ণ হয়ে যখন যতীন দাস বৃহত্তর কলেজী জীবনের দ্বারদেশে উপনীত, সারা ভারতব্যাপী তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে মথিত হচ্ছে। যুবক যতীনের সমস্ত অন্তর ঐ সময় হতেই চঞ্চল ব্যাকুল হয়ে ওঠে, শৃঙ্খলিতা স্বদেশ জননীর মুক্তির জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে, দ্বিধা বা কোনরূপ সঙ্কোচ না করেই যুবক এগিয়ে গেল ঃ স্বদেশ আমার, জননী আমার।

কাজ শুরু হলো প্রথমে কংগ্রেসের আওতায়।

পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে যতীন দাস যখন দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, যোগাযোগ ঘটলো তার বিপ্লবী শচীন সান্যালের সঙ্গে।

অভ্যুত্থান হলো দক্ষিণ কলকাতা তরুণ সমিতির।

বিপ্লবীর মনে বিপ্লবের বীজ ব্যাপ্ত হল।

দেশেও তখন গণ-আন্দোলনের ঢেউ অনেকটা চাপা পড়ে বিপ্লববাদ তলে তলে গোপনে আবার নতুন করে প্রসার লাভ করছে।

যতীন্দ্রনাথ পুরোপুরিই অগ্নিরক্ষা পথটাই বেছে নিল।

বিপ্লবী দীর্ঘজীবী হোক।

গোপনে ঘরে ঘরে চললো আবার নবোদ্যমে প্রস্তুতি; বোমা গোলাগুলি রিভলবার যোগাড় হতে লাগলো। সংগৃহীত হতে লাগলো।

১৯২৪-এর ৫ই নভেম্বর গ্রেপ্তার হয়ে কিছুকাল যতীন্দ্রনাথকে কারাগারেও কাটাতেহলো।

সেই সময়েই একবার যতীন দাস শ্বেতাঙ্গ সরকারের নীতি ও আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কুড়িদিন অনশন করে,পরে সরকার প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অনশন ভঙ্গ করে।

১৯২৯-এর বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির রংপুর অধিবেশনে বিপ্লবী নেতারা আবার অনেকেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়।

পরবর্তীকালে খণ্ড খণ্ড সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রথম পরিকল্পনা বিপ্লবীদের মধ্যে আলোচিত হয় ঐ সাক্ষাতের সময়েই।

যতীন দাসের উপরেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং উত্তর ভারতে বিপ্লবীদলগুলির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

শুধু তাই নয় হাতমোবা তৈরী করবার দক্ষতাও ছিল যতীন দাসের।

এদিকে দিবালোকে জনবহুল লাহোরের রাস্তায় কুখ্যাত সাণ্ডার্সকে হত্যা করবার পর গোপনে পলায়ন করে ভগৎ সিং কলকাতায় চলে যায় এবং সেইখানেই অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ ও নানা আলোচনা চালায় কয়েকদিন ধরে।

ঐ সময়েই ভগৎ সিং দিল্লীর পরিষদভবনে বোমা নিক্ষেপ করবে বলে জানায় এবং যথা সময়েই যে বোমার অগ্ন্যুদ্গার শোনা গিয়েছিল দিল্লী পরিষদ ভবনে এবং যার ফলে ধৃত হয়ে হয়ে ভগৎ সিংয়ের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় সে তো আগেই বলা হয়েছে।

দিল্লী আইন পরিষদে বোমা নিক্ষিপ্ত হবার পরদিনই লাহোরে ‘কাশ্মিরী হাউস’ খানাতল্লাসী হলো ও ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল।

ভীতত্রস্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার ক্ষ্যাপা কুত্তার মত দেশের যুবকদের ধরতে শুরু করলো,সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে।

অনেকের সঙ্গে যতীন দাদও ধৃত হলো।

ফলাও করে সরকার বাহাদুরের ‘লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা’র হলো পত্তন।

নিরুপায় বন্দীদের প্রতি সরকারি পদলেহী, উচ্ছিষ্টভোগী বেতনভুকদের শুরু হলো দুর্ব্যবহার, নির্যাতন ও পীড়ন আবার।

বন্দীদের মধ্যে অনেকেই বললে: আমরা অনশন করবো।

যতীন দাস কিন্তু প্রতিবাদ জানাল: বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ও কার্যের সেটা হবে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। অহিংস সংগ্রাম আমাদের নয়। আমরা চিরদিন সশস্ত্র বিপ্লবের পথে চলেছি। সেই আমাদের উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ সমর্থন জানাল—আবার কেউ কেউ সমর্থন করলে যতীন দাসের প্রস্তাব। অবশেষে প্রতিবাদকল্পে অনশনই শুরু করা হবে স্থিরীকৃত হলো।

দেশের লোক স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনলো লাহোর জেলে একদল বন্দী বিপ্লবী অনশন শুরু করেছে এবং তাদেরই মধ্যে একজন যতীন দাস।

একটি দুটি করে দিন যায়। অগণিত দেশের নরনারী বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় শোনে যতীন দাসের শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে কিন্তু তথাপি প্রতিজ্ঞা তার ভঙ্গ হয়নি, সরকার পক্ষের অনশন ভঙ্গ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

জোর করে নলের সাহায্যে পাকস্থলীতে আহার্য ভরে দিতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো। খাদ্যবস্তু পাকস্থলীর বদলে ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয়ে দারুণ যন্ত্রণা দেখা দিল।

জ্ঞান লুপ্ত হলো যতীনের।

দিন অতিবাহিত হয়ে চলেছে একটির পর একটি। দেহ ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে যায়।

মাংসপেশী শুকিয়ে লীন হয়ে যায়। নাড়ীর গতি ক্ষীণ, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ। ভাইয়ের শয্যার পাশে কিরণ দাস এসে বসল, তাও একটি শর্তে: জ্ঞান বা অজ্ঞান কোন অবস্থাতেই তাকে যেন খাদ্য ও পানীয় না দেওয়া হয়।

পাছে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কখন জল পান করবার কোন দুর্বল মুহূর্তে মনের মধ্যে ইচ্ছা জাগে নিজহাতে তাই জলের কলসীটা পর্যন্ত ভেঙে ফেলেছিল যতীন।

একটি দুটি করে বাহান্ন দিন গত হলো। বাঁচবার আর কোন আশাই নেই।

মৃত্যুর কালোছায়া নেমে এলো। তথাপি প্রতিজ্ঞায় ধীর স্থির!

মৃত্যুও বুঝি অসঙ্কোচে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে দুয়ারের কাছে। আরো দশটা দিন কেমন করে যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল।

বাষট্টিতম দিবস। দেশের অগণিত নরনারী বালক যুবা কিশোর উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে প্রতিমুহূর্তে কণ্টকিত হচ্ছে।

নাড়ীর গতি আরো ক্ষীণ। আরো দুর্বল। প্রাণ বুঝি আর বক্ষপিঞ্জরে থাকে না!

চৌষট্টিতম দিবস, ১৯২৯–১৩ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

সকাল হতেই দেখা দেয় হিক্কা। অবয়ব ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। হৃৎপিণ্ডের গতি এই বুঝি থেমে যায় এত ক্ষীণ। দেখতে দেখতে শেষ সময়: মহাপ্রয়াণের লগ্ন কাছে ঘনিয়ে এলো।

মধ্যাহ্নসূর্য আকাশে এসে ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াল: স্বর্গের দেবদূতেরা এলো।

রথ প্রস্তুত।

ক্ষীণ কণ্ঠ একটিবার শুধু কম্পিত হলো ঃ বন্দেমাতরম্।

শেষ! সব শেষ!

মৃত্যুহীন প্রাণটুকু নিঃশেষে দান হয়ে গেল।

সাশ্রুনেত্রে জেলের কর্তৃপক্ষ ক্ষীণ অস্থিচর্মসার মৃতদেহটি কিরণ দাসের হাতে তুলে দিল।

বিদ্যুৎ গতিতে সংবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল।

শোকে দেশবাসী মূহ্যমান হয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাল নবযুগের নব দধীচিকে।

লাহোরের কারাপ্রাচীরের বাইরে বিরাট জনতা তাদের প্রিয় যতীনকে দেখবার জন্য উদগ্রীব ব্যাকুল অশ্রুসজল চক্ষে অপেক্ষা করছে।

পাঞ্জাবের জননেতারাও এলেন।

শবদেহ বহন করে সকলে যখন জেলের ফটকের বাইরে চলেছে, দরজার উপরে দাঁড়িয়ে পুলিশ সুপার শ্বেতাঙ্গ হ্যামিল্টন হার্ডিং।

তারও চোখের পাতা দুটো সজল হয়ে ওঠে।

নিঃশব্দে মাথায় টুপি খুলে মাথা নোয়ার শ্বেতাঙ্গ।

তথ্যসূত্র

নীহাররঞ্জন গুপ্তের ‘বিদ্রোহী ভারত’ বইয়ের ৩৩৩ – ৩৩৭ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া।

প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩।

প্রকাশকাল: প্রথম মিত্র ঘোষ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯১, দ্বিতীয় মুদ্রণ: আষাঢ় ১৩৯৫।

অমর শহীদ যতীন দাস

দেবাশিস্ বসু

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দিগণ একযোগে অনশন ধর্মঘটে শামিল। এঁদের মধ্যে একজনের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ক্রমশ নিকটবর্তী হতে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত চিকিৎসকগণ তাঁকে অন্ততপক্ষে একটু ঔষধ সেবন করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। মৃত্যুপথযাত্রী অনশনব্রতীকে শেষ মুহূর্তে ঔষধ সেবন করবার সনির্বন্ধ অনুরোধ-উপরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। তারপর দেহে ও মনে শক্তি সঞ্চয় করে তিনি চিকিৎসগণকে জানালেন যে, তিনি অনশন-ধর্মঘটব্রত গ্রহণ করেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে। সেই ব্রত উদযাপিত না হওয়া পর্যন্ত তার পবিত্রতা নষ্ট করতে পারবেন না।

এই অটল পৌরুষের প্রতীক-পথিক, অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিপ্লবীর নাম জানো? ইনি হলেন যতীন্দ্রনাথ দাস।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর কলকাতায় যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার বিখ্যাত অনুশীলন সমিতির ইনি ছিলেন একজন সদস্যকর্মী। দলের সাংগঠনিক কাজের জন্য তিনি যখন দিল্লি গিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় দিল্লির আইন পরিষদে বোমা পড়ে। শুরু হয়ে যায় ব্যাপক ধর-পাকড়। ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু ও বটুকেশ্বরসহ যতীন্দ্রনাথও বন্দি হন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন তারিখে বোমা নিক্ষেপের মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি-বীর ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগী বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করেন। এই আমৃত্যু অনশন সংগ্রামকে আরও বলিষ্ঠ ও কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে ১৩ জুলাই, ১৯২৯ তারিখে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অপরাপর রাজবন্দিগণসহ বিপ্লবী যতীন দাস অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলেন।

অনশনের ব্যাপকতায় শাসকশ্রেণী বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সরকারি মত পরিবর্তনের আভাস দেন। এই মর্মে এক সপ্তাহের মধ্যে একটি সরকারি ইস্তাহার প্রচার করে তাঁরা জানালেন যে, স্বাস্থ্যের কারণে, অনশন ও ধর্মঘটিদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে সরকার রাজি হয়েছে। এই সরকারি ভাষ্যের চাতুরিটুকু বুঝতে পেরে অনশন ধর্মঘটিগণ ওই শর্তাধীন সরকারি স্বীকৃতি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং জানালেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক

বন্দিদের শর্তহীনভাবে একটি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত না করা পর্যন্ত তাঁরা অনশন–ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন।

যতীন দাসের অনশন-ধর্মঘটের সাতদিন অতিবাহিত না হতেই লাহোর কারাগারের চিকিৎসক অনশনকারী যতীন দাসকে বলপূর্বক তরল আহার্য গ্রহণ করে অনশনভঙ্গের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই সূত্রে সাত-আট জন পাঠান রক্ষীসহ চিকিৎসক যতীন দাসের সামনে উপস্থিত ছিলেন। ইঙ্গিতমাত্র পুলিশবাহিনী অনশনব্রতী যতীন দাসের ওপর পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী, কুস্তিগির যতীন দাস একাকী সেই সাত-আট জন পাঠান সান্ত্রীর সঙ্গে লড়ে গেলেন। কিন্তু এই অসম যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে? তাই কিছুক্ষণ পর রণক্লান্ত যতীন দাস ভূতলশায়ী হতে বাধ্য হলেন।

এই সুযোগে চিকিৎসক কালবিলম্ব না করে যতীন দাসের নাকের মধ্যে রবারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে নলটাকে তাঁর পাকস্থলীর দিকে ঠেলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুততার সঙ্গে ওই নলের মধ্যে দুধ ঢেলে যতীন দাসকে পান করাবার চেষ্টা করলেন। বলপূর্বক দুধ পানের প্রচেষ্টায় যতীন দাসের দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বীর-বিপ্লবী যতীন দাস অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে আবার একদল ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন এবং যতীন দাসকে পরীক্ষা করলেন। চিকিৎসগণ প্রমাদ গণলেন। তাঁরা জানালেন যে, অনশনী যতীন দাসের ফুসফুস বিদ্ধ হয়েছে। তাঁর জীবনের আশা অতিশয় ক্ষীণ। তাঁরা আরও জানালেন যে, অনশনব্রতীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় তাঁকে দ্বিতীয়বার বলপূর্বক খাদ্য গলাধঃকরণের প্রচেষ্টার ঝুঁকি নেওয়া আরও বিপদজনক। এক কথায় অসম্ভব।

এইভাবে যতীন দাসের শারীরিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে সহসা লুপ্ত হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল চিরতরে। নিষ্ঠুর অসাড়তা সমগ্র শরীরকে গ্রাস করল।

যৌবনোদ্দীপ্ত, পেশিবহুল, বলিষ্ঠ যতীন দাসের ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও সঙ্কুচিত হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যেতে শুরু করল। পড়ে রইল শুধু একটা কঙ্কাল। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখা যায় না। সহ্য করা আরও শক্ত। তবু তাঁর সঙ্গীরা নিশিদিন এই অকুতোভয় বীরের পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মতো বসেছিলেন। বাঙালি কেমন করে মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে – তারই সাক্ষী হয়ে রইলেন বীর যতীন দাসের বীর সহকর্মীরা।

ওদিকে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনশনব্রতী যতীন দাসের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির সংবাদ দেশবাসী আকুল আগ্রহ ও চরম উদ্বেগের সঙ্গে পড়তে লাগল। অনশন ধর্মঘটের আন্দোলন কারাকক্ষের লৌহবেষ্টনী ও উচ্চপ্রাচীর ডিঙিয়ে ক্রশম ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল।

ইতিমধ্যে যতীন দাসের অবস্থা আরও সংকটময় হয়েছে। জীবন-প্রদীপ অস্থিরভাবে কাঁপছে। ওদিকে, কারাভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি ইংরেজ রাজপুরুষদের এই বর্বরোচিত হিংস্র ব্যবহারে সারা দেশময় ধিক্কার ধ্বনি ও প্রতিবাদের ঝড় উঠল। সরকার এই প্রবল জনমতকে আর অগ্রাহ্য করতে সাহস করল না। রাজনৈতিক বন্দিদের বিশেষ মর্যাদা দেবার প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করে দেখতে রাজি হল সরকার এবং বিভিন্ন প্রদেশে কারাগারের বিষয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য 'তদন্তকমিটি' গঠনের সংবাদ ঘোষিত হল।

অনতিবিলম্বে 'পাঞ্জাব-কারাগার তদন্ত কমিটি' অনশনরত বন্দিদের সাথে কারাগারের ভিতরে সাক্ষাৎ করলেন। আলোচনা করলেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনশনব্রতী বিপ্লবীগণ অনশনভঙ্গে স্বীকৃত হলেন। অনশনকাতর মৃতপ্রায় বীর যতীন দাস সম্পর্কে কমিটি স্থির করলেন যে, তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হবে।

কিন্তু একটু পরেই ইংরেজ সরকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল। জানাল যে, এই মুক্তি 'জামিন সাপেক্ষ হবে'। বিপ্লবী যতীন দাস সরকারের এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। শর্তাধীন মুক্তিতে তিনি আগ্রহী নন। মৃত্যুই শ্রেয়।

কর্তৃপক্ষ তখন আর একটি কূটকৌশলের আশ্রয় নিল। তারা প্রথম যতীন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাস ও পরে তাঁর পিতা বঙ্কিমবিহারী দাসকে দুরভিসন্ধির জালে জড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাঁরা সরকারি ধূর্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করল না।

তথাপি ইংরেজ সরকার তার স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণ্য চক্রান্ত থেকে নিবৃত্ত হল না। একজন অনুগত রাজভক্ত প্রজাকে দিয়ে যতীন দাসের মুক্তির অনুকূলে জামিননামায় স্বাক্ষর করিয়ে যতীন দাসের শর্তাধীন মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। সেই সূত্রে যতীন দাসকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে অতি সত্বর এক শক্তিশালী পুলিশবাহিনীর সাথে একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি জেল হাসপাতালে উপস্থিত হল।

অনশনরত যতীন দাসের সহযোগীদের কাছে যখন এই তথ্য প্রকাশিত হল, তখন তাঁরা সরকারের এই সীমাহীন নীচতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর

যতীন দাসের পবিত্র সম্মান রক্ষার জন্য তাঁরা সমবেতভাবে যতীন দাসের ওয়ার্ড-এর দরজার সম্মুখে লোহার খাটের ফ্রেম জড় করে প্রবেশদ্বার এমনভাবে রুদ্ধ করে দিতে মনস্থ করলেন, যেন কিছুতেই যতীন দাসকে সেখান থেকে সরান না যায়। তারপর উপস্থিত পুলিশবাহিনী ও হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের মৃতদেহ অতিক্রম না করে তাঁদের প্রিয় নেতা যতীন দাসকে সেখান থেকে নড়াতে পারবে না।

পুলিশ-বাহিনীর এক পদস্থ কর্মচারী যতীন দাসের সামনে এলেন। যতীন তখন সেই পুলিশকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তাঁর দেহ কেউ স্পর্শ করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে তিনি তার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে প্রতিরোধ করবেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির এই অকল্পনীয় সিদ্ধান্তের কথা শুনে চিকিৎসকরা শিউরে উঠলেন। চিকিৎসকরা জানালেন যে, এই অবস্থায় তাঁকে সরানোর চেষ্টার অর্থ তাঁকে হত্যা করার সামিল। এই অভিমত শুনে কেউ আর এগোতে সাহস করলেন না।

সেই অবিস্মরণীয় দিনটি হল, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। এই ঘটনার সাতদিন পর মরণজয়ী বিপ্লবী বীরের জীবন প্রদীপ যখন অকস্মাৎ নিভে গেল, তখন যতীন দাসের অনশন ৬৩ দিন অতিবাহিত হয়েছে। সময় দুপুর একটা। তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, স্থান–লাহোর জেল হাসপাতাল।

একটি মহান সংগ্রাম শেষ হল। কিন্তু সেই সংগ্রামের ঢেউ আছড়ে পড়ল আসমুদ্রহিমাচল। যতীন দাস মৃত্যু দিয়ে যে জীবন্ত সেতু সেদিন নির্মাণ করে গেলেন, পরবর্তীকালের দেশপ্রেমিক মুক্তি-সেনানীরা সেই সেতু অতিক্রম করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট নিয়ে এলেন বহু-আকাঙ্খিত স্বাধীনতা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছিলেন: 'বাংলাদেশের যুবসমাজের ভেতর থেকে সহস্র সহস্র যতীন দাস আমরা চাই, যারা তাঁর আত্মোৎসর্গের ভাবকে রূপায়িত করবে। তীব্র জাতীয় চেতনা সম্পন্ন নতুন একদল যুবক আমাদের অবশ্যই চাই, কারণ, তারাই ভাবী ভারতবর্ষকে নির্মাণ করবে, যে ভারতবর্ষে কৃষক, শ্রমিক নির্বিশেষে সকল নরনারী স্বাধীনতার আশীর্বাদ উপভোগ করবে।'

তথ্যসূত্র

দেবাশিস্ বসুর 'মহাজীবনের গল্প: বাংলার বিপ্লবীদের গল্প-কথা' বইয়ের ৪৬ – ৪৯ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া।
প্রকাশক: প্রারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯। প্রকাশকাল: ২০১২

সে তীর্থ-কুণ্ড ছুঁয়ে এসেছি

সুধাংশু দাশগুপ্ত

যতীন দাস ছিলেন বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতির সদস্য। তিনি ছিলেন কালীঘাট তরুণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। আগ্রায় গিয়ে তিনি উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের বোমা বানানো শিখিয়ে ছিলেন।

লাহোরের রাজপথে স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সূচনা। এই মামলায় বটুকেশ্বর দত্তকে অভিযুক্ত করেও প্রমাণাভাবে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। চন্দ্রশেখর আজাদকে অভিযুক্ত করেও তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এই মামলায় ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং শিবভার্মা, জয়দেব কাপুর, ডা. গয়াপ্রসাদ, কমল তেওয়ারি, বিজয় সিন্‌হা, কুন্দনলালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এঁদের সকলকেই এবং বটুকেশ্বর দত্তকে আন্দামার সেলুলার জেলে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে এঁরা সকলেই গভীর আত্মানুসন্ধানের মত্র দিয়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির যিনি ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সেক্রেটারি ছিলেন সেই কমরেড অজয় ঘোষও এই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ছিলেন। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে অভযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো লাহোরের বোরস্টাল জেলে অনশনে বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যুবরণ।

তখনকার দিনে জেলখানা চিল নরককুণ্ড। জেলখানায় চোর-ডাকাত-খুনীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের একই পর্যায়ে রাখা হতো। কিন্তু ইউরোপিয়ান চোর-ডাকাত-খুনীনের জন্য কিছু পৃথক ব্যবস্থা – তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হতো খাওয়া ও থাকার ব্যাপারে। এতদিন রাজনৈতিক বন্দীরা এই ব্যবস্থার কোন প্রতিবাদ করেননি। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরাই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দাবি করে তাঁরা জেলখানার মধ্যে অনশন-ধর্মঘট শুরু করেন। ৬৩ দিন অনশন করে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে যতীন দাস জীবন আহুতি দিলেন। যতীন দাসের এই মৃত্যুবরণের পর ব্রিটিশ শাসকেরা জেল আইনের কিছুটা পরিবর্তন করে –

বন্দীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয়। সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী বন্দীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় তাঁদের কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে রেখে দেওয়া হলো। ব্রিটিশ শাসকদের এ এক অদ্ভুত প্রতিশোধ নেওয়ার মনোবৃত্তি।

কারাগারে যতীন দাসের মৃত্যু ঘটে ১৩ই সেপ্টেম্বর। ১৫ই সেপ্টেম্বর রাতে তাঁর মরদেহ নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছাল লাহোরের কংগ্রেস নেতারা। সে রাত্রে তাঁর মরদেহ রাখা হলো হাওড়া টাউনহলে। ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর মরদেহ নিয়ে হাওড়া টাউনহল থেকে এক বিরাট মিছিল বের হয় কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের উদ্দেশ্যে। সেই মিছিলের দৃশ্য ছিল অভূতপূর্ব। একজন সশস্ত্র বিপ্লবীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সেদিন কাতারে কাতারে মানুষ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। এই মিছিলেই বাংলাদেশের বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে একখানা গোপন ইশ্‌তেহার বিলি করা হয়। সেই ইশ্‌তেহারের শিরোনামায় ছিল কবি জনরুলের একটি কবিতারই প্রথম লাইন – লেখা "রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা" ।...

এই গোপন ইশ্‌তেহার রচনা করেছিলেন তখনকার দিনের বিপ্লবী মাসিক পত্রিকা 'বেনু'র সম্পাদক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

এই ইশ্‌তেহারখানা তখনকার দিনের তরুণ-তরুণীদের মনে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্ত বিপ্লবী নিকেতন কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুহীন' পুস্তকে যতীন দাস সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"যতীন দাসের নির্বাপিত চিতা স্পর্শ করার আকুলতায় প্রচণ্ড ভিড় তখনো জমা হয়েছিল শ্মশানে ও বাহিরে বহুদূর পর্যন্ত। কোনক্রমে আমি সে তীর্থ-কুণ্ড ছুঁয়ে এসেছি।

শ্রান্ত মনে ফিরে আসতেই হাতে পেলাম পথের ভিড়ে একটি ইশ্‌তেহার। পড়ার ধৈর্য ছিল না। যত্ন করে নিয়ে এলাম গৃহে।

ঘরে ঢুকে শয্যায় আশ্রয় নিতেই মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠেছিল। এই মৃত্যু – এর অর্থ কি? তাৎপর্য কি? এ কি এখানেই শেষ? ঐ অগ্নিকুণ্ডে ভস্মে রূপান্তরিত হয়েই কি এর বিরাম?... নিজের অজ্ঞাতেই ইশ্‌তেহারখানা খুলে ধরলাম। শিরোনামা পড়তেই চোখ বিস্ফোরিত হয়ে এলো! তাতে লেখা: "রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা"...

তারপর – বারে বারে, বহু লক্ষ বার, বহুদিন ধরে পড়েছি সে ইশ্‌তেহারের মর্মবাণী। রক্তে আগুন লেগেছে আমারো, দেশের সকল ছেলে-মেয়ের মতো। এই ইশ্‌তেহার পড়েই বুঝলাম, যতীন দাসের মৃত্যু দিয়ে মাত্র শুরু হলো আগুনের মিছিল। এর বিরাম নেই। ঐ শান্ত, স্তব্ধ অন্তর-বেদনা ঐ স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীর প্রশমিত অগ্নিজ্বালা, ঐ মহা অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের কঠিন প্রত্যয় – এসব কিছুর অভ্যন্তরেই দারুণ ঝড়, ভীষণ সংগ্রামের প্রতীক্ষা লুকিয়ে আছে।

হলো- ও তাই। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ সাল অবধি সেই ঝড়, সেই সংগ্রাম সারা ভারতবর্ষকে আলোড়িত করে দিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সকল তটু ভূমি জুড়ে তাণ্ডব রচনা করল।"

এর ফলশ্রুতি – ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

একথা বলা আদৌ অসঙ্গত নয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীমূলে যতীন দাসের জীবন আহুতি বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের মনে যে বিপ্লবের বহ্নিশিখার আবির্ভাব ঘটালো তারই রেশ চললো সারা ১৯৩০-৩১ সাল ধরে।

সুধাংশু দাশগুপ্তের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা' বইয়ের ৫০ – ৫২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া।

প্রকাশক: নন্দলাল চ্যাটার্জি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২-এ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০ ০৭৩।

প্রথম সংস্করণ: ১৯৯০, নবম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০০৯

মৃত্যুঞ্জয় যতীন দাস

নলিনীকিশোর গুহ

স্বামী বিবেকানন্দ চাহিলেন ভারতের ইস্পাতকঠিন চরিত্র দেশভক্ত তরুণের দল।

কবি গোবিনন্দদাস শুনাইলেন:

"লোহার চাইতে বেশি শক্ত ভক্ত বীরের মাংস রক্ত,

তাঁদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈরি হয়।"

দেবরাজ্য উদ্ধারের জন্য দধীচির ত্যাগ-তপস্যায় সেই বজ্র তৈয়ারি হইয়াছিল, পুরাণে পড়িয়াছি। আর বিপ্লব যুগে প্রত্যক্ষ করিলাম – ইস্পাতকঠিন চরিত্র বস্তুটি কি? দেখিলাম, সত্য-সংকল্পনিষ্ঠ বীর ভক্ত তরুণ যতীন দাসের তিলে তিলে মৃত্যুবরণের অভূতপূর্ব, অতুলনীয় মহিমা।

এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছি, বাংলার দধীচি যতীন দাস ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার (তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা) অন্যতম আসামি। দক্ষিণ কলিকাতার তরুণ যুবক যতীন কেমন করিয়া উত্তর ভারতের বিপ্লব ষড়যন্ত্রে যুক্ত হইলেন সে সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিয়াছিলাম। কিন্তু বাংলার এই দধীচির আত্মদানের মহিমা কেন অতুলনীয়, সেই সম্পর্কেই যতটা সাধ্য (সম্যক না হউক) এ স্থানে বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

এই ষড়যন্ত্র মামলায় আসামিগণ (ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরুও ছিলেন) রাজনীতিক বন্দিদের একই স্পেশার শ্রেণীর দাবিতে অনশন আরম্ভ করেন। যতীন দাস প্রথম হইাতে সায় দেন নাই। তিনি ইহার বিরোধী ছিলেন এই কারণে যে বিদেশি শাসক রাজনীতিক বন্দিদের দাবি, তা যত ন্যায়সঙ্গতই হউক, মানিয়া নিবে না। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে, দীর্ঘকাল অনশন ক্লেশ ভোগ করিয়াও শেষ পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ করিতে হয় – দাবির মর্যাদা রক্ষিত না হইলেও। অনশন প্রস্তাবে তাই যতীনের সায় ছিল না। কিন্তু সহকর্মীগণ অনশন আরম্ভ করিলে যতীনও অনশনে যোগ দেন।

কিছুদিন পরে কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধ-উপরোধ এবং সরকার তাঁহাদের দাবির কতক মানিয়া লইবার ও কতক মানিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দরুণ অনশন-ধর্মঘটীগণ অনশন ভঙ্গ করিলেন, কিন্তু যতীন দাস অনশন ভাঙিলেন

না। কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে দাবি পূরণ করা হয় নাই। অনশন-ব্রতধারী যতীন দাস তাই মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্পে অটল রহিলেন।

কোন খাদ্যই গ্রহণ করব না– এই সংকল্পে অটল থাকিয়া যতীন দিন দিন নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছেন। একদিকে যতীনকে বাঁচাইয়া রাখার সম্ভাব্য যাবতীয় প্রয়াস– অপর দিকে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার ভয়াবহ ক্লেশ সহ্য করিয়া চলিতেছেন অভীঃ- মন্ত্রের সাধক যতীন।

সব চেষ্টা ব্যর্থ হইলে শেষ চেষ্টা হিসাবে কর্মসাথী ভগৎ সিং প্রভৃতিকে আনা হইল অনুরোধ করার জন্য। যতীন ভগৎ সিংকে বলিলেন – তোমরা মাঝপথে অনশন ভেঙেছ – কিন্তু আমি তা পারি না!

ভগৎ সিং অন্তরের সমস্ত আকুতি দিয়ে যতীনকে বলেন, তুমি এত দীর্ঘ দিন যে ক্লেশ সহ্য করেছ তা ব্যর্থ হয়নি। এর ফল ফলবেই এমন আশার সঙ্গত কারণ আছে– (কেন্দ্রীয় আইনসভায় জননেতাদের বক্তব্য, দাবি, আলোচনা– এবং সরকারের অভিমত দৃষ্টে যাহা মনে হইয়াছিল) তোমার এই অনশনের ফল দেখবার জন্যও আর কিছুদিন বেঁচে থাকো। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রধান প্রধান দাবি পূরণ না হয়– আমরা, অন্তত আমি, শুকদেব, বটুকেশ্বর আমৃত্যু অনশন করব– কথা দিচ্ছি।

ভগৎ সিংকে আশ্বাস দিয়ে যতীন বলেন, বেশ আমি আরও ১৪ দিন বেঁচে থাকব।

পাশে ছিলেন ডা. ভার্গব, তিনি বলেন – তুমি কিছু না খেয়ে কি করে বাঁচবে?

যতীন বলেন – হ্যাঁ, বাঁচব – ইচ্ছা শক্তিতে (by will power)।

এরই নাম কি ইচ্ছামৃত্যু।

এই তো – 'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলরে'। জাতির মুক্তিসাধক – মুক্তিযজ্ঞের হোমানল জ্বালিয়ে সমিধ রূপে আত্মহুতি দিলেন – নিজ দেহ, নিজের বুকের পাঁজর নিঃশেষ করে।

যতীনের জীবনপ্রদীপ নির্বাপিতপ্রায়। কনিষ্ঠ কিরণ দিনরাত শয্যাপার্শ্বে সেবা-শুশ্রূষারত, ভগৎ সিং প্রভৃতিসহ দাদার প্রিয় সবাই গাহিতেছেন – 'বন্দে মাতরম্', 'সুজলাং সুফলাং', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে – তবে একলা চলরে।' মৃত্যু আসন্ন – 'তেন ত্যক্তের ভুঞ্জীথাঃ'র সাধক অভীষ্ট পাইয়া গিয়াছেন – তৃপ্ত। 'আমার জীবনে লভিয়া জনম জাগরে সকল দেশ'। রাজনীতিক বন্দির স্পেশার শ্রেণীর দাবি তখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সকলের ঊর্ধ্বে দেশ ও জাতি যা বিপ্লবীর সাধনার বস্তু।

দেশের মুক্তির জন্য যতীন দাসের এই আত্মত্যাগের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে সারা পঞ্চনদে – সারা লাহোর জেলে। জেলময় ধ্বনি উঠিয়াছে – ‘বন্দে মাতরম্’ – ‘যতীন দাস জিন্দাবাদ’। সমগ্র জাতির সঙ্গে যতীনের একাত্মবোধ, ভালবাসার স্পর্শমণি সেদিন পাঞ্জাবেও ঐক্যের বান ডাকাইয়াছে।

আলোচনা যতীনেরও কানে গিয়াছে যে যতীদের মৃতদেহ বাঙালিদের কালীবাড়িতে লইয়া গিয়া দাহ করা হইবে। এই সিদ্ধান্তে নির্বাপিতপ্রায় বাতি শেষবার জ্বলিয়া উঠিল। যতীন সর্বশক্তি সংহত করিয়া – কনিষ্ঠ কিরণকে ইশারায় আরও কাছে আনিয়া, মৃদু কিন্তু স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন–কালীবাড়ি নয়, আমি বাঙালি নই, – আমি ভারতীয়।

স্পষ্টতই দেখা যায় এক বিরাট মহান রূপান্তর ঘটিয়াছিল অনশন-ব্রতধারী সত্যনিষ্ঠ যতীনের অন্তর সত্তায়–তাই তিনি সানন্দে অনশনে মৃত্যুবরণ করার অতুলনীয় মহিমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন – যাহা আর সকলে পারে না – পারে নাই।

অতঃপর যতীনের মৃত দেহ লইয়া সমস্যা। শেষ পর্যন্ত জেল হইতে শবদেহ ট্রেনে কলিকাতায়ই আনিতে দিতে হইল। পথে পথে সর্বশ্রেণীর দেশবাসীর প্রীতি- ভালবাসার পুষ্পার্ঘ নিবেদন, জীবনদানের বিজয় অভিযান। সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে যতীন দাসের শবদেহ লইয়া কলিকাতায় সেই নীরব গম্ভীর শান্ত শোক শোভাযাত্রারও বুঝি তুলনা নাই।

তথ্যসূত্র
বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহের ‘বাংলায় বিপ্লববাদ’ বই থেকে নেয়া।

ঐতিহাসিক আন্দামান অনশন ও তিনটি মৃত্যু

কালীপদ চক্রবর্তী

১৯৩৩ সালের বারোই মে থেকে আমরণ অনশন শুরু হলো। দলে দলে বন্দীরা অনশনে যোগ দিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সবাই এই অনশন ধর্মঘটে যোগ দিল। এই সময় যেসব দাবি আমরা করলাম তা হল–১.সিগ্রিগেশন তুলে নিতে হবে, ২. নিয়মিত সংবাদপত্র সরবরাহ করতে হবে ও লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে, ৩. রাতে সবার জন্য আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, ৪. লোনা জলের পরিবর্তে মিঠা জলে স্নানের ব্যবস্থা করতে, ৫. রাত্রে পায়খানা- প্রস্রাবের সুব্যবস্থা করতে হবে, ৬. নিত্য পুঁইশাক ইত্যাদির পরিবর্তে হার্ড ভেজিটেবল যেমন আলু, বেগুন, পটল ইত্যাদি তরিতরকারি খাবার হিসেবে সরবরাহ করতে হবে, ৭. মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে বরাদ্দ করতে হবে, ৮. ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে, ৯. চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ ও হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি।

অনশন শুরু হতেই বন্দীদের জামা-কাপড় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের দাঁত মাজার ব্রাশ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেওয়া হল। সকলকেই জাঙ্গিয়া কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হল। প্রথম প্রথম সকালে বিকালে সেলগুলো খুলে দিলেও এবং স্নান করার সময় সেলের বাইরে যাওয়ার সুযোগ দিলেও পরে সব বন্ধ করে দেওয়া হল। অনশনকারী সকল বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হল ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। একমাত্র পায়খানা প্রস্রাবের সময় ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা সেলের দরজা বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হল। বাইরে অদূরে কখনও উত্তাল তরঙ্গায়িত ও অশান্ত এবং কখনও মৃদু হিল্লোলিত শান্ত সমুদ্র ছাড়া দেখবার ও জানবার কিছু ছিল না।

দূরে বহুদূরে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ। পনেরো দিন পর পর বাংলাদেশ ও মাদ্রাজ থেকে ‘মহারাজ’ জাহাজখানা আন্দামান যাতায়াত করতো। কিন্তু কোন খবর পাওয়া যেত না, যেন দুনিয়ার বাইরে এক অদ্ভুত জগতে আমরা বসবাস করছি।

তখন বাংলাদেশে জন এন্ডারসনী সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম হয়েছে। কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারছিল না। বিপ্লবী আন্দোলন চললেও জাতীয় আন্দোলন নিষ্পেষিত হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী জেলে আটক, পত্র-পত্রিকার মুখ

বন্ধ। চারিদিকে শ্বাসরুদ্ধকরণ পরিস্থিতি চলছিল। ঐ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের হাতে গোপনে আনা টাকা পয়সা যা কিছু ছিল তা দিয়ে গোপনে ভারতে সংবাদ পাঠানো হল। জানতাম না, সে সংবাদ দেশের মাটিতে পৌঁছাত কিনা!

তিনটি মৃত্যু

একদিন দু'দিন করে পাঁচ-ছয়দিন কেটে গেল। বন্দীদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়লো। কিন্তু তবু কেউ অনশন ভাঙ্গলো না। এভাবে প্রায় বারো দিন কাটানোর পর বন্দীদের শারীরিক অবস্থা যখন খুব খারাপের দিকে মোড় নিতে লাগলো তখন কর্তৃপক্ষের টনক নড়লো। তারা জবরদস্তির সঙ্গে বন্দীদের নাকের ভেতরে পাইপ ঢুকিয়ে তরল খাবার খাওয়াবার চেষ্টা চালাতে লাগলো। উদ্দেশ্য কোন রকমে বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখা ।

সেই যন্ত্রাণাময় দিনগুলোর কথা আজও মনের তাড়নায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জেলের এক মাত্র ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার যমদূতের মত বিশাল দেহী কয়েদীদের নিয়ে প্রত্যেকটি সেলে জোর করে ঢুকছে। তাদের উদ্দেশ্য সরকারের নির্দেশমত অনশনরত বন্দীদের নাকে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার জোর করে পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া। দেখা গেল, জবরদস্তিকারী দলটি যাতে সেলে ঢুকতে না পারে সেজন্যে কোন কোন সেলের দরজা কাঠের তক্ত পোষ দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু অনশনক্লিষ্ট বন্দীরা ক্ষয়মান শক্তি দিয়ে কতক্ষণই বা একদল জোয়ান লোককে আটকে রাখতে পারে। তারা এক একটা ধাক্কায় প্রতিরোধ সরিয়ে এক একটা সেলে ঢুকতে লাগলো। তারপর সবাই মিলে জোর করে অনশনর তবন্দীকে মেঝে বা বিছানাতে আছড়ে ফেলে, কেউ বা মাথা চেপে ধরে, কেউ বা বুকের উপর বসে পড়ে তাকে কাবু করে ফেলল। আর সেই সুযোগে ডাক্তার তার নাকের ভেতর রবারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে তার ভেতর দুধ ঢেলে অনশনরত বন্দীকে খাবার খেতে বাধ্য করলো। খাওয়া শেষ হলে রবারের নল টেনে বের করে নিলে দেখা গেল, কারো কারো নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। এভাবে কয়েকজনের নাক জখম হল এবং ঐ জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থায় অনশনরত সব বন্দীকে তরল খাবার গেলানো হতে লাগলো।

ঐ যখন অবস্থা তখন একদিন সন্ধ্যার পর কানাঘূষা শুনতে পেলাম, তিনজন বন্দী হাসপাতালে। শুনলাম, জোর করে নাক দিয়ে দুধ খাওয়াতে গিয়ে তিনজনের ফুসফুসে দুধ গিয়ে ঢুকেছে। এরা হলেন, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মহাবীর সিং, অস্ত্র আইন মামলায় অভিযুক্ত মোহিত মৈত্র এবং

ময়মনসিংহ ডাকাতি মামলার বন্দী মোহন কৃষ্ণ নমোদাস। তাদেরকে নাকি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত এই ঘটনার আগেই মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার এসে পৌঁছেছিল।

কানাঘুষা চলতে লাগলো। কিন্তু সঠিক কোন সংবাদ পাওয়ার উপায় নেই। ফুসফুসে দুধ ঢোকার অর্থ মৃত্যু। কিন্তু তাদের মৃত্যুর কোন সংবাদ জানা গেল না।

সতেরো দিনের দিন হাসপাতালের কয়েদীদের মাধ্যমে ফালতু ও একজন সিপাহী মারফত এ ধরনের একটা সংবাদ এলো যে, ওরা তিনজনই মারা গেছে এবং ওদের লাশ নাকি পাথর বেঁধে সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ খবর সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো স্নানের সময়, তখন সকলকে স্নানের জন্য করিডোরে আনা হয়েছিল। সবাই খবর শুনে দুঃখে শোকে মূহ্যমান হলেও বিক্ষোভে ফেটে পড়লাম আগুনে বোমার মত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিপাত কামনা করে শ্লোগানও উঠলো। আমরা সবাই ঠিক করলাম জেল কর্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে সঠিক খবরাখবর না জানায় তবে বন্দীদের কেউই সেলে ঢুকবেন না, লকআপে যাবেন না। শ্লোগান উঠলো, মহাবীর সিং জিন্দাবাদ ইত্যাদি। আমাদের এই তৎপরতা ছিল জেল আইনে জেল-বিদ্রোহ।

তাই জেল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল। পাঠান, পাঞ্জাবী, বাঙালি, বালুচ সেপাই ও কয়েদিদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জমায়েত করলো। প্রত্যেক সেলের গোড়ায় গোড়ায় কয়েকজন করে লাঠি হাতে দাঁড় করিয়ে দিল।

জেল কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে সকল রাজবন্দীকে নিজ নিজ সেলে চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন। কিন্তু বন্দীরা অটল। সাথী বন্দীদের সঠিক সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তারা সেলে যাবে না। প্রয়োজনে সবাই একসঙ্গে মরতে প্রস্তুত।

অনেক রাতে জেলার সাহেব এলেন। তিনি জানালেন তিনজনই মারা গেছেন। চতুর্দশ দিনে ফুসফুসে দুধ ঢুকে পাঞ্জাবের মহাবীর সিং মারা যায়। পাবনার মোহিত মৈত্র মারা যান পনেরো দিনের দিন। আর ষোড়শ দিনে মারা যান ময়মনসিংহের মোহন দেব। সবার চোখ জলে ভরে গেল। সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল সেলে। এরপর অনশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর সেলের দরজা খোলে নি।

ঐ রাতেই ইউরোপীয় মেডিক্যাল অফিসার দলবলসহ সেলের দরজায় দরজায় 'হাউ ডু ইউ ডু, আর য়্যু ফিলিং বেটার?' (কেমন আছো, একটু ভালো লাগছে তো? বলে বলে যাওয়ার সময় আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। আমার সেলের সামনে সামনে এসে দাঁড়িয়ে ও কথা জিজ্ঞেস করাতে আমি রুক্ষ কণ্ঠে

জবাব দিলাম, 'আই ডোন্ট লাইক টু টক উইথ ইউ, এজ ইয়োর ম্যান হ্যাজ কিল্‌ড থ্রি অব মাই ফ্রেণ্ডস' (তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতে হচ্ছে না। কারণ তোমার সাঙ্গোপাঙ্গেরা আমার তিন বন্ধুকে মেরে ফেলেছে।

সে কোন জবাব দিল না। কিন্তু মনের আয়নায় দেখতে পেলাম তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে। আমার সেলের সামনে থেকে এগিয়ে যাওয়ারসময় তাঁর চলার ভঙ্গি দেখে বুঝলাম সে খুবই ক্ষেপেছে।

ফল ফলতে দেরি হল না। আমার গরম মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হল। দুদিন স্যালাইন ডুস দেওয়া হল এবং ঐ দুদিনের জন্য আমাকে হাতকড়া পরিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল।

শহীদ মহাবীর সিং

ঠাকুর মহাবীর সিং ১৯৩০-এর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। উত্তর প্রদেশের ঠাকুর পরিবারের এই সন্তান যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্তান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। পরিণতিতে শহীদ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেব-এর সঙ্গে ঐ একই মামলায় অভিযুক্ত হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

লম্বা, বলিষ্ঠ, জোয়ান চেহারা ছিল মহাবীর সিং-এর। একজোড়া পাকানো গোঁফ রাজপুত বীরের ছাপ এঁকে দিয়েছিল তাঁর চেহারায়। অথচ, মিটি মিটি চাউনি আর শিশুর সরল হাসি এক আশ্চর্য মানবিকতার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিল তাঁর চোখে-মুখে ও হাব-ভাবে।

সেলুলার জেলের অমানবিক বর্বর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের আমরণ অনশনের প্রথম দিন থেকেই মহাবীর অনশনে সামিল হয়েছিলেন। ৫ নম্বর হলের তেতলার শেষ দিকের এক কুঠরিতে তালাবদ্ধ অবস্থায় তাঁর অনশনরত দিনগুলো কাটছিলো। পাশেই ছিলো সহবন্দী সিরাজুল হক ও মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার সেল। বদ্ধ কুঠরি থেকেই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা আর হাসি ঠাট্টার বিনিময় চলছিল অনশন-দিনগুলোতেও। বহু অনশনে শাণিত ও পোড়খাওয়া মহাবীর সে সময়েও অনশনের ক্লেশকে উপেক্ষা করে যন্ত্রণাময় দিনগুলিকে একে একে পাঁড়ি দিচ্ছিলেন।

১৭ই মে দুপুর বেলা থেকে কর্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়াবার পালা শুরু করলে একদল সেপাই তাঁর কুঠরির তালা খুলেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মহাবীর আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। শুরু হয় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। দেড় ডজন

সেপাইয়ের দলটি প্রথমে একটু হিমশিম খেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাবীর সিংকে কাবু করে ফেলে কয়েকজন তাঁর বুকে, পেটে, হাঁটুতে চেপে বসে এবং মাথাটাকে একজনের দুই হাঁটুর মাঝখানে এমনভাবে চেপে ধরে যেন সে একটুও মাথা নাড়াতে না পারে। কিন্তু তবু চলে মহাবীরের নিষ্ফল প্রতিরোধ। তাঁর মুখে তরল খাবার ঢোকাবার জন্য রাবারের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হল। মহাবীর তা দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে কেটে ফেলে। হিংস্র সেপাইদল এত প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয় যে তাদের বর্বরতা ও জবরদস্তি চরমে ওঠে। কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে এমন জোর করে তারা মুখের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দেয় যে তা গলনালী দিয়ে না ঢুকে শ্বাসনালীতে ঢুকে যায়। ফুসফুস ফেটে গিয়ে মহাবীরের দেহ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে।

যন্ত্রণাকারত মহাবীর জ্ঞান হারাবার আগে পাশের সেলের সহবন্দী সিরাজুল ও মনোরঞ্জনের কাছে তার চরম কষ্টকর অবস্থার কথা ব্যক্ত করলেও কুঠরিতে তালাবদ্ধ সাথীরা কিছুই করতে পারে নি।

অবশ্য কিছুক্ষণ পরে এসেই জল্লাদ সেপাইদল অজ্ঞান মহাবীরকে কুঠরি থেকে বের করে নিয়ে যায়। সে রাতেই আমাদের সবার অগোচরে মহাবীর সিং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাপুরুষ জেল কর্তৃপক্ষ মহাবীরের কোন চিহ্নই রাখেনি। গোপনে রাতের আঁধারে জেল থেকে তাঁর মৃতদেহ বের করে নিয়ে ভারী পাথর বেঁধে তা সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শহীদ মোহন কিশোর

মোহন কিশোর নমোদাস ১৯৩৩ সালের জঙ্গি অনশন সংগ্রামের দ্বিতীয় শহীদ। তপশীলী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এক গরীব কৃষকের সন্তান ছিলেন মোহন কিশোর। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহমুকার সরারচর গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ি।

সাধারণ লম্বা ও একটু ভারী গড়ন ছিল মোহন কিশোরের। গোলগাল মুখখানায় মাঝে মাঝে বসন্তের দাগ। চেহারায় হাবভাবে গ্রামের সারল্য। ছোটবেলা থেকেই মোহন কিশোর মানুষের সেবার কাজে অগ্রণী ভল্টান্টিয়ার। অবশেষে অনুশীলন দলে যোগ দিয়ে বিপ্লবী কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

নেত্রকোণা সোয়ারীকান্দা গ্রামে ডাকাতির অভিযোগে অন্যান্যদের সঙ্গে মোহন কিশোরও ১৯৩২ সালে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে মোহন কিশোর সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিচারে তাঁর সাত বছর কারাদণ্ড হয় এবং কিছুদিন পর তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়।

অনশন সংগ্রাম শুরু হলে মোহন কিশোরও অন্যান্যদের সঙ্গে এই জঙ্গি লড়াইয়ে যোগ দেন। মহাবীর সিংয়ের সঙ্গে একই দিনে একই রকম বর্বরতার শিকার হলেন তিনি। ফুসফুসে দুধ ঢুকে যাওয়ায় তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় তাকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়! দ্রুত তিনি নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। জেল হাসপাতালে সতর্ক পাহারায় সহবন্দীদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ অথচ অনশনরত মোহন কিশোর ১৭ই মে থেকে ২৬শে মে পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছেন। লক্ষ্য ও সংগ্রামে অবচিল মোহন কিশোর স্বেচ্ছায় এক ফোঁটা ওষুধ কিংবা এক চামচ খাবারও গ্রহণ করেননি। ২৬শে মে মোহন কিশোর সেই সেলুলার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হন।

গ্রেফতার হওয়ার মাত্র তিন দিন আগে মোহন কিশোর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী জীবনের এক বন্ধনহীন গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। জীবন সর্বস্ব দিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মোহন কিশোরের সেদিনের সেই কিশোরী সহধর্মিনী আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু অনশন যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে মোহন কিশোর আজও অমর হয়ে রয়েছেন।

শহীদ মোহিত মৈত্র

পাবনা জেলার নতুন ভারেন্দা গ্রামে ছিল মোহিত মৈত্রের পূর্বপুরুষের বাসস্থান। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা নদী। ছেলেবেলা থেকেই ঐ নদীর প্রশস্ততা ও উদার-উদাস পরিবেশ ছিল মোহিতের নিত্যসঙ্গী। ফরসা ধারালো চেহারার মোহিতের সুন্দর মুখের আদল, তাঁর প্রণোচ্ছল কথাবার্তা, তাঁর গলার সুকণ্ঠ সঙ্গীত সবাইকে মুগ্ধ করতো। সঙ্গীত ও সুন্দরের সাধনায় নিবেদিত প্রাণ মোহিত যৌবনের দ্বার প্রান্তে এসে বিপ্লবের অগ্নিবীণায় সুর সাধতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। যুগান্তর দলে রংপুর গ্রুপের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলে এক সময় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগেরপবিত্র সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি যখন একটি আগ্নেয়াস্ত্র কিনে ফিরছেন তখনই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অস্ত্র আইনে তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ডের প্রায় এক বছর কাল আলিপুর জেলে স্বাধীনতা সংগ্রামী

অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে তাঁর দিন কাটে। সে সময়ে সবাই গানে গল্পে হাসিতে উচ্ছ্বাসে মোহিতের প্রাণোচ্ছলতার পরিচয় পান।

মোহিত ছিলেন সকলের বন্ধু—অজাতশত্রু। জেল জীবনের কর্কশ ক্লেশকে মোহিত গানে সরস করে তুলতেন। সুকণ্ঠ মোহিত কখনো একা গাইতেন, কখনো দল বেঁধে গাইতেন। গানের আসরে টেনে আনতেন সবাইকে। গান ছিল মোহিতের প্রাণ ; তাঁর প্রাণ ছিল গানময়।

অনশন সংগ্রাম শুরু হবার মাত্র কয়েকদিন আগে মোহিত আলিপুর জেল থেকে সেলুলার জেলে আসেন। এসেই তিনি অনশন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৭ মে তারিখে জোর করে খাওয়ানোর নামে যে বর্বরতা চলে মোহিত তারই শিকার হন। ফুসফুসে দুধ ঢোকানোতে প্রথমে যন্ত্রণা, তারপর জ্বর, তারপর নিমোনিয়া। জেল হাসপাতালে মোহন কিশোরের পাশাপাশি আলাদা একটা কেবিনে তাঁর যন্ত্রণাকাতর দেহ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে পুরো বারোটি দিন। বন্ধু-প্রিয় মোহিত সেই মৃত্যুপথের দিনগুলিতে তাঁর প্রিয় মুখগুলির কথা বার বার মনে করেছে। সিরাজুল হক, কালিদাস রায়-এদের নাম ধরে ডেকেছে মৃত্যুর আগে। গানের সুর ভেজেছে। সেই যমুনা পারের উদাসী হাওয়ায় লালিত মোহিতের কণ্ঠে অস্ফুট বেজেছে তাঁর প্রিয় গানের কলি – 'চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায়'। তারপর ২৮ শে মে গানের কণ্ঠ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে একসময় তাঁর জীবন প্রদীপের যবনিকা টেনে দিয়েছে।

শহীদ মোহিতের জন্যও অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা হয়নি। লোকচক্ষুর আড়ালে তাঁর জীবনহীন দেহটি ভারী পাথরে বেঁধে কসাইয়ের দল এবারডিন উপকূলে গভীর সমুদ্রে হাঙ্গরের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সুদর্শন সুগায়ক প্রাণোচ্ছ্বল মোহিত মৈত্র শহীদ হয়ে আমদের অন্তরে চিরজীবী হয়ে আছেন।

কালীপদ চক্রবর্তীর'অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান স্মৃতি' বইয়ের ১৫৭ – ১৬৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া।

প্রকাশক: মফিদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২ কমরেড মণিসিংহ সড়ক, মুক্তিভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল: ফাল্গুন ১৩৯৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

মানুষের মতো মরেই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে

নলিনী দাস

১৯৩৩ সালের মে মাসের মধ্যে বন্দীদের দাবি না-মানা হলে তিন দিন তারা বিভিন্ন ব্যাচে আমরণ অনশন শুরু করবে। এই সিদ্ধান্ত চীফ কমিশনারকে জানিয়ে দেওয়া হলো। ৭ দিনের ভিতর সমস্ত রাজবন্দীরা একে একে অনশনে যোগ দিল। ব্যতিক্রম দেখা দিল চট্টগ্রাম গ্রুপের ভিতর। তাদের মাঝে প্রধানত নেতৃস্থানীয় বন্ধুরা কৌশলের প্রশ্নে একমত হতে না পেরে অনশনে যোগ দিলেন না। তাদের যুক্তি হলো-অনশনের কৌশল বিপ্লবীদের নয়। সরকারের বিরুদ্ধে বাইরে সংগ্রাম করেছি-জেলের ভিতর সংগ্রাম করতে হলে মিউটিনি বা বিদ্রোহ করব। কৌশল যে বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভরশীল ও পরিবর্তনশীল, এই শিক্ষা সমস্ত বন্ধুকেই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ব করতে হয়েছে। সেদিন কয়েকজন অনশন না করায় রাজবন্দীদের মধ্যে বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

যাহোক, চীফ কমিশনার চরম দরখাস্তের উপর লিখে দিলেন; "I shall not budge an inch" C. Commissioner. "আমি সামান্যতম দাবিও মানব না"- চীফ কমিশনার। অধিকাংশ বড় অফিসার ছিল বিলেত থেকে আসা সাহেব। এর মধ্যে এক মাত্র জেলারই একটু উদার ছিল। জানা গেল চীফ কমিশনার তাকে বলেছে; "Let their dead bodies be floating on the ocean",- বন্দীদের মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসতে দাও।"

বাংলাদেশ থেকে টাকা-পয়সা যা কিছু গোপনে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল তা দিয়ে ভারতে সংবাদ পাঠানো শুরু হলো। তখন বাংলাদেশে চলছে এণ্ডারসনী শ্বেতসন্ত্রাসের যুগ। কংগ্রেসী আন্দোলন ও বিপ্লববাদী আন্দোলনে তখন ভাটার টান পড়েছে। তৎসত্ত্বেও মানুষ হিসাবে বাঁচতে গেলে তখন অনশন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

অতঃপর আমরণ অনশন শুরু হলো। প্রথম দিকে সকালে ও বিকালে সেলগুলো খুলে দিত। স্নান করার সময় সেলের বাইরেও যেতে দিত। অনশনের প্রথম দিনেই জমা-কাপড়, এমনকি ডিভিশন 'টুর' টুথ-ব্রাশ ও টুথ-পাউডার পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হলো। সকলকেই জাঙ্গিয়া ও কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হলো। প্রচুর জল খাওয়া ও স্নান করার সুযোগ থাকার জন্য অনশনকারী বন্ধুরা প্রথম কয়েকদিন ভালোই ছিল।

পাঁচ-ছয় দিন পরেই শরীরে চরম দুর্বলতা দেখা দিতে শুরু করল। ৭ দিনের দিন বিকাল থেকেই জোর করে নাকের ভিতর নল ঢুকিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা শুরু হলো। রাজবন্দীরা কিছুতেই খাবে না, কিন্তু সরকারের প্রচেষ্টা হলো জোর করে খাবার পেটে ডুকিয়ে বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখা।

সে এক পৈশাচিক কাণ্ড। অনশন চলাকালে যমদূতের মতো কয়েকজন পাঠান, পাঞ্জাবী ও বাঙালী জোয়ান-কয়েদী কালো পোশাক পরে প্রত্যেক সেলের সম্মুখে এসে উপস্থিত হতো। তখনও বাংলা রেঙ্গুন আর মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার এবং কম্পাউন্ডারএসে পৌঁছায় নি।

জেলের ছোট ডাক্তার সঙ্গত রায় আন্দামানের এক কয়েদীর ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করার পর সরকারই তাকে কোনোরকম সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি দিয়ে দিয়েছে। কম্পাউণ্ডার চকরকান্দী এই জেলেই যাবজ্জীবন সাজা খেটেছে এবং বন্দী অবস্থায় হাসপাতলে কাজ করে কম্পউণ্ডারী শিখেছে। মুক্তির পর সে সেলুলার জেল-হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার হয়েছে। এই ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার জোর-জবরদস্তি করে রাজবন্দীদের নাকের ছিদ্রনালীর ভিতর পাইপ ঢুকিয়ে দিয়ে দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করল। যমদূত জোয়ানরা বন্দীকে চিৎ করে ফেলে, পাঁচ-ছয় জন জোর করে হাত-পা-মাথা চেপে বসে থাকে, খাটের সাথে হাত-পা বেঁধে দেয়; তখন ডাক্তার নাকে নল ঢুকিয়ে দুধ বা অন্য কিছু তরল পদার্থ পেটে দেবার ব্যবস্থা করে। খাওয়ানো শেষ হলেই দুর্বল আর পরিশ্রান্ত বন্দীকে ফেলে রেখে তারা চলে যায়।

এ-এক পাশবিক ব্যবস্থা। সন্ধার সময় প্রথমে সেল থেকে সেলে কিছু কানা-ঘুষা, তারপর সেল হতে সেলে চিৎকার করে সংবাদ আদান-প্রদান চলতো। জানা গেল, তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এরা হলেন: (১) মহাবীর সিং (লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা), (২) মোহিত মিত্র, (অস্ত্র-আইন মামলা), (৩) মোহন দাস (ময়মনসিংহ ষড়যন্ত্র মামলা)। তিনজনেরই ফুসফুসে দুধ গিয়েছে। এর অর্থ যে মৃত্যু তা বন্দীদের জানা আছে। এরপর সেলে আবদ্ধ বন্দীদের মনের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

সাত দিনের দিন, জোর করে খাওয়াবার ঠিক প্রথম দিনেই মহাবীর সিং-এর মৃত্যু হয়। কিন্তু এই মৃত্যুর সংবাদ বন্দীরা জানে না।

১২ দিনের দিন মারা যায় মোহিত।১৩ দিনের দিন সকাল বেলায় মারা গেল মোহন।

হাসপাতালের কয়েদী-ফালতুরা এবং একজন সিপাহী গোপনে এই সংবাদ সরবরাহ করল। ওরা আরও জানাল যে, মৃতদেহগুলোকে পাথর বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

১৩ দিনের দিন এই সংবাদ বন্দীদের কাছে পৌঁছাবার সাথে সাথেই বন্দীরা সব আগুন হয়ে উঠল। চিৎকার শুরু হয়ে গেল: কত মৃত্যু চায় পশু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা দেখে নিতে হবে।বন্দীরা ঘোষণা করল: সঠিক সংবাদ পাওয়ার পূর্বে তারা সেলে বন্ধ হবে না, লক আপ রিফিউজ করা হলো। জেল কোর্ডে একে বলে জেল-মিউটিনি।

খবর চটাই, সঠিক খবর চাই। **মহাবীর, মোহন, মোহিত জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, স্বাধীন ভারত কি জয়।** শ্লোগনে শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠল বন্দীশালা। বিরাট চেহারার পাঠান, পাঞ্জাবী, বাঙালী ও বেলুচকে বাইরের থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে; রেগুলেশন লাঠি হাতে তাদের ৪/৫ জনকে প্রত্যেক সেলের নিকট এনে দাঁড় করানো হলো। তারপর হুকুম হলো-যাও, সেলে যাও।

বন্দীদের দৃঢ় জবাব: না, যাবো না। সংবাদ, সংবাদ সঠিক সংবাদ চাই। বীরবন্দীরা ধরে নিয়েছেন তাদের শেষ দিন, শেষ মুহূর্তে রাত্রি বাড়তে লাগল। বন্দীরা এতটুকু বিচলিত নয়। রাত ১০ টায় জেলার সাহেব এলেন। জেলার সাহেব আমাদের নারায়ণদা ও নিরঞ্জনদাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে বললে, দুঃখের বিষয় মোহন, মোহিত ও মহাবীর-তিনজনই মারা গেছে।

শেখ রফিক সম্পাদিত ‘বিপ্লবী নলিনী দাস রচনাসমগ্র’ বইয়ের ৬৩–৬৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া।

প্রকাশক: রিয়াজ খান, রোদেলা প্রকাশনী, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা, ২০০৯

শিবেন রায়

ব্রিটিশ আমলে কারা আইনের আমূল সংস্কার ও রাজবন্দীদের মর্যাদা ও অধিকার আদায় করতে গিয়ে অনশনে আত্মহুতি দিয়েছেন যতীন দাস, মহাবীর সিং, মোহন কিশোর ও মোহিত মৈত্ররা। তাঁদের আত্মদানের বিনিময়ে ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার 'Security Prisoners Rules" এর মাধ্যমে রাজবন্দীদের বিশেষ মর্যাদা ও কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। কিন্তু পাকিস্তানী সরকার "East Bengal Special Ordinance" জারি করে রাজবন্দীদের সব ধরণের অধিকার ও মর্যাদা তুলে নেয়। এ বিষয়ে পাকিস্তানী সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়, "ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্বে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য তৎকালীন রাজবন্দীগণ আত্মত্যাগ করিতেন বলিয়া তাহাদিগকে দেশসেবক ও আত্মত্যাগী হিসাবে পরিগণিত করা হইত এবং সেই জন্যই তাহাদিগকে জেলে পদমর্যাদা ইত্যাদি দেওয়া হইত। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক পঞ্চম বাহিনীর দল নবলব্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার মানসে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করেন। এতএব সরকারের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক বন্দীরা কোন পদমর্যাদা বা অন্য প্রকার সুবিধা লাভ করিতে পারেন না।"

এই আইন পাশের পর "সরকার বিনা বিচারে আটক বন্দীদের রাজবন্দী হিসাবে বিচার করতে রাজী হল না। রাজবন্দীদের খাবার এবং পরিধেয় প্রতিটি সাজাপ্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য করা হল। সে এক অসহনীয় অবস্থা। এর বিরদ্ধে প্রতিবাদ করা ছাড়া রাজবন্দীদের সামনে আর কোন পথ খোলা থাকলো না। জেলখানায় এই প্রতিবাদের রূপ হল অনশন ধর্মঘট। অধিকাংশ রাজবন্দীদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল ঢাকা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে। ঢাকা ও রাজশাহী কারাগারের রাজবন্দীরা মর্যাদার দাবীতে ৪৮-৪৯ সালে চার বার অনশন ধর্মঘট করেন। প্রথম অনশন ধর্মঘট ৩১ দিন, দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘট ৩৩ দিন, তৃতীয় অনশন ধর্মঘট ৪৫ দিন ও চতুর্থ অনশন ধর্মঘট ৬১ দিন স্থায়ী হয়। ৬১ দিন অনশন ধর্মঘটের সময় ঢাকা জেলে কুষ্টিয়ার শিবেন রায় মৃত্যুবরণ করেন।" (আবদুল হক, খাপড়াওয়ার্ডের বিপ্লবী)

"কারা আইনের আমূল সংস্কার করে নতুন করে কারা আইন প্রবর্তন এবং বিচারাধীন মামলাসমূহের অতি দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন কমিউনিস্ট বন্দীরা। জেলের অভ্যন্তরে এসব দাবি উত্থাপন ও আন্দোলন গড়ে তুললে, উত্তেজিত ও বেসামাল হয়ে সরকার কমিউনিস্ট বন্দীদের ওপর দমন-পীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

লড়াইয়ের অন্যতম পন্থা হিসেবে রাজবন্দীরা বেছে নেন অনশনকে। ১৯৪৯ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, ঢাকা ও রাজশাহী জেলের কমিউনিস্ট বন্দীরা ৪ দফায় মোট ১৫০ দিন অনশন করেন। খুলনা জেলে পিটিয়ে হত্যা করা হয় কমিউনিস্ট কর্মী কমরেড বিষ্ণু বৈরাগীকে। কমিউনিস্ট কর্মী কমরেড নাদেরা বেগমের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা জেলে অনশন শুরু হয়। এই খবর পেয়ে রাজশাহী জেলেও কমিউনিস্ট বন্দীরা অনশন শুরু করেন। কমিউনিস্ট বন্দীরা চেষ্টা করেন সব জেলে একযোগে আন্দোলন গড়ে তুলতে। বদলীকৃত বন্দীদের দ্বারা তখন খবর আদান-প্রদান করা হতো। ঢাকা জেলে জোর করে অনশনকারীদের ফিডিং করাতে গেলে, ৮ ডিসেম্বর কমরেড শিবেন রায়ের মৃত্যু হয়। সরকার কিছু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

রাজবন্দীদের মর্যাদার দাবিতে ব্রিটিশ আমলে ৬৩ দিন অনশন করে জীবন দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট কর্মী কমরেড যতীন দাস। ১৯৪১ সালে হিজলী বন্দী নিবাসে গুলি করে কমিউনিস্ট কর্মী কমরেড সন্তোষ মিত্র ও কমরেড তারকেশ্বর সেনকে হত্যা করা হয়। এসব আত্মদান আন্দোলনকারী বন্দীদের প্রেরণা জোগাতো।" (অনিরুদ্ধ দাশ অঞ্জন)

অনশন চলাকালীন সময়ে কমরেড শিবেন রায়কে "একদিন জেল ডাক্তার ন্যাজাল ফিডিং বা নাক দিয়ে খাওয়াতে এল। কিন্তু শিবেন কি কারণে বাধা দিয়ে মাথা ঝাঁকুনি দিলেই নলের দুধ ফুসফুসে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্ত মুখে উঠতে লাগল। এর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শিবেনের প্রাণনাশ হয়। উভয় পাশের সেলের বন্দীরা শিবেনের মৃত্যুকালীন পা ছোঁড়াছুড়ি এবং গোঙ্গানির শব্দ পেয়ে আকুলভাবে চীৎকার করতে থাকে। তখন রাত। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে সজোরে লোহার জানালার উপর আঘাত হানতে থাকে এবং শিবেন–শিবেন–কী হয়েছে বলে আর্তনাদ করতে থাকে। জল্লাদ ডাক্তার, আরও দুই একজন সিপাহী মৃত শিবেনকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। পরে বেশ রাত থাকতে তার লাশ সেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিপ্লবী যতীন দাসের মত পাকিস্তানে রাজ-বন্দীর মর্যাদার লড়াইয়ের প্রথম শহীদ শিবেন। শুনেছি, আজও তাঁর পিতা জীবিত। সেই শোকোন্মাদ অশীতিপর বৃদ্ধ বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়ে কাকেও যেতে দেখলে শিবেন – শিবেন বলে ডাক দেন।" (কারাস্মৃতিঃ আবদুশ শহীদ)

(সংকলিত)

Jatindra Nath Das

Born: October 27, 1904, Kolkata, India
Died: September 13, 1929, Lahore, Pakistan

"As the days rolled by, one by one the hunger-strikers dropped off, but young Jatin was invincible. He never hesitated, never faltered for one small second but marched straight on towards death and freedom. So Jatin died on September 13th. But he died a martyr's death. After his supreme sacrifice, the whole country gave him an ovation which few men in our recent history have received. As his body was removed from Lahore to Calcutta for cremation, people assembled in their thousands and tens of thousands at every station to pay their homage.Ó

– Subhas Chandra Bose

Jatindra Nath Das – also known as Jatin Das – was an Indian freedom fighter and revolutionary. The death of Jatin Das in Lahore jail after 63 days of hunger strike shocked the whole of India

Jatin Das was born on 27 October 1904, in the middle class family of Bankim Behari and Suhasini Das in Calcutta. He was a bright student and passed the Matriculation and Intermediate examinations in the First Division.

At the young age of 17, Jatin was inspired by patriotic zeal. He was greatly influenced by the movement for Independence and registered his participation by joining the Anushilan Samiti, a revolutionary outfit in Bengal.

By 1921 the prevailing political atmosphere of Bengal was surcharged with revolutionary fervour. In this year Jatindra participated in Gandhi's Non-Cooperation movement. He was arrested and sentenced to six months rigorous imprisonment for picketing.

In November 1925, while studying for a B.A. at Vidyasagar College in Kolkata, Jatindra Nath was arrested for his political activities and was imprisoned in Mymensingh Central Jail. At the Mymensingh Central Jail, he went on hunger strike in protest against the ill-treatment meted out to political prisoners. After 20 days, when the Jail Superintendent offered apology, Jatin gave up the fast.

His sense of discipline and the qualities of leadership were discernible even at that young age and he held positions of importance in many political and social organizations of Calcutta. His wide-ranging political activities brought him in contract with the revolutionaries in other parts of the country and let him into clandestine manufacture of explosives.

After his release, Jatin Das agreed to train up Bhagat Singh's comrades. He also got involved in bomb-making for Bhagat Singh and other revolutionaries.

On June 14, 1929, Jatin was arrested in Calcutta. He was named as one of the accused in what came to be known as Supplementary Lahore Conspiracy Case and was transferred to the Lahore Jail.

In the Lahore jail, Jatin Das together with fellow prisoners went on an indefinite hunger strike demanding jail reforms and rights of prisoners and under trials. The conditions of Indian prisoners and that of the English prisoners were poles apart. Indian inmates were given unwashed jail uniforms, the food was infested with rats and cockroaches and no newspapers were provided.

This memorable hunger strike started on 13 July 1929 and lasted 63 days. The jail authority took many measures to feed Jatin, including attempts to feed forcefully. However, Jatindra did not eat. Sustained by his sense of discipline and determination, he waged a superhuman struggle against the might of the

Government and persisted with his hunger strike for sixtythree days.

Jatin Das died hunger strike unbroken, on 13 September. As his body was carried from Lahore to Kolkata by train, thousands of people rushed to every station to pay their homage to the martyr. A two-mile long procession in Kolkata carried the coffin to the cremation ground. The hunger strike of Jatin Das in prison was one crucial moment in the resistance against illegal detentions, and highlighted cold-hearted brutality of British colonialism.

The martyrdom of Jatindra Nath Das was in the best traditions of our patriotic fervour and revolutionary spirit which sought to through the sufferings and sacrifice of the people.

Red Salute Jatin Dad.

[Collected]

Information Source: Internet

পরিশিষ্ট ০১

অনশন এক অদ্ভূত সংগ্রাম। শরীরধর্মের ঠিক বিপরীত জিনিস। শরীর রক্ষার বদলে স্বেচ্ছায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। হঠাৎ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়ার চাইতে অনেক বেশি সাহস, মানসিক দৃঢ়তা ও প্রস্তুতি চাই এর জন্য। দিনের পর দিন আহার থেকে বঞ্চিত হয়ে শরীরের কোষ সমূহ শুকিয়ে আসবে, জীবনীশক্তি হয়ে আসবে স্তিমিত, নিষ্প্রভ। নিজে সচেতনভাবে সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে হবে তবেই হয়তো জীবন মৃত্যুর সীমান্তস্থলে পৌঁছে সে সাফল্য অর্জন করা যাবে।

– সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

বন্দী জীবন, পৃষ্ঠা – ৫৫

এই সময়ে ভারতের ইতিহাসে, সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। এখানেও বাঙ্গালির বিদ্রোহী স্বভাবের গৌরব করিবার আছে। কারাবিধির প্রতিবাদে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার 'আসামিরা' অনশন শুরু করেন। এবং শেষাশেষি মৃতুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথ দাসেরই মহাপ্রয়াণ হয়। সত্যি, ভাবা যায় না, মানুষ এমন করিয়া মৃত্যুকে প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিয়া মরিতে পারে? এতো সংগ্রাম করিয়া মরা নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির মধ্যে সশস্ত্র মৃত্যু নয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গুপ্ত-ঘাতকের হাতে মরা নয়, ইংরাজের সেলে জিয়ানো বন্দীর ফাঁসিমঞ্চে মৃত্যু নয়, এ বজ্রপাত নয়, ঘূর্ণি নয়, বন্যা নয় অথবা ট্রাম, বাসের নিচে চাপা পড়িয়া মরা নয় অথবা আহার সংগ্রহ করিতে পারিলাম না বলিয়া অনশন-মৃত্যু নয়। প্রতিদিন যেখানে আহারের আমন্ত্রণ, বাঁচাইবার ব্যবস্থা, সেখানে অসম্মানে খাইব না, বাঁচিব না বলিবার একি মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প। মৃত্যু আসে, ধীরে প্রতি পলে পলে। প্রতিটি-প্রত্যঙ্গ, প্রতি-মাংসপেশি, প্রতি অস্থিকণা, প্রতি-রক্তবিন্দু বিচরণ করিয়া আসে, নিস্পন্দ অতিস্থবির গতি, পাকস্থলি হইতে মগজ পর্যন্ত অচল সঞ্চরণ। চেতনা যেখানে জাগ্রত, মর্যাদাবোধ যেখানে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ করিয়াছে। যতীন্দ্রনাথকে কথার মালার শ্রদ্ধার্ঘ দিতে চেষ্টা করিলে তাহা ব্যঙ্গ হইবে মাত্র। যতীন্দ্রনাথ অতুলনীয়।

–পুলকেশ দে সরকার

পরিশিষ্ট ০২

অনশনে জেলে মৃত্যু

যতীন দাস – পিতা বঙ্কিমবিহারী দাস, বাড়ী দক্ষিণ কলিকাতা। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতির সহিত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। লাহোর জেলে রাজবন্দীদের দাবী দাওয়া লইয়া অনশন ধর্মঘটশুরু হয়। ৬৩ দিন অনশন ধর্ম্মঘটের পর ১৯৩২ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। যতীন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ চন্দ্র লাহোর হইতে যতীন দাসের শব কলিকাতা লইয়া আসে। হাওড়া স্টেশন হইতে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দুই লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা যতীনের শব দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত গমন করিয়াছিল।

মহাবীর সিং – লাহোর ষড়যন্ত্র [২য়] মামলায় দণ্ডিত হন। তিনি আন্দামান সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

মোহিত মৈত্র – আন্দামানে সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

মোহন দাস – আন্দামান সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

হরেন্দ্র মুন্সী – ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

অনিল কুমার দাস – ঢাকা জেলে মৃত্যু ১৯৩১ সালে।

মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী – বাড়ী কাশী। ফতেহগড় সেন্ট্রাল জেলে অনশনে মৃত্যু।

পণ্ডিতরাম রক্ষা – বাড়ী ইউ. পি.। ১৯১৬ সনে আন্দামান সেলুলার জেলে পৈতা কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার প্রতিবাদে অনশন করেন। দুই মাস অনশনের পর মৃত্যু হয়। পৈতা দেওয়া হয় নাই।

– ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (মহারাজ)

জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা- ৩০৪

মহাবীর সিং ছিলেন হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির সক্রিয় সদস্য। শহীদ ভগৎ সিং-এর সহকর্মী তিনি। মোহনকিশোর নমোদাসের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার সরারচর গ্রামে (বাংলাদেশ)। কৃষক পরিবারের সুসন্তান। মোহিতমোহন মৈত্রএর বাড়ি পাবনা জেলার নতুন ভারেঙ্গ গ্রামে (বাংলাদেশ)। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সাল, কলকাতায় একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ মোহিত মৈত্র গ্রেপ্তার হন।

– রূপময় পাল

পরিশিষ্ট ০৩

আমি যখন দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করি, তখন যতীন দাস মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা করিয়াছে, আমিও সময় সময় তাহাদের বাড়ী গিয়াছি, মাঝে মাঝে রাত্রে সেখানে কাটাইয়াছি। যতীনের সেবা-যত্ন ভুলিবার নয়। যতীন ছিল নির্ভীক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ৬৩ দিন অনশনের ফলে জেলে যতীনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে রাজনৈতিক বন্দীদের জেলে কোন শ্রেণী-বিভাগ ছিল না, সকলকেই সাধারণ কয়েদীর মত থাকিতে হইত। যতীনের অনশনের ফলে দেশব্যাপী যে তীব্র আন্দোলন দেখা দেয় তাহারই ফলে জেলে শ্রেণী-বিভাগ হয়। অবশ্যই যতীন চাহিয়াছিল, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে একটা বিশেষ শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিতে। যতীন অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল। যতীন দাসের মৃত্যুর পর তাহার শবের শোভাযাত্রায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

– ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (মহারাজ)

জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা- ১১৫

পরিশিষ্ট ০৪

যতীন দাসের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি গান লিখলেন ভগৎ সিং–

"ওয়াক্ত আনে সে বতা দেঙ্গে তুঝে ও আসমা

হম অভি সে ক্যা বতায়ে ক্যা হামারা দিল মে হ্যায়।"

সময় হলে বল আমি কি বলতে চেয়েছিলাম।

আজ আমি কি করে বলি, আজ আমার কণ্ঠরুদ্ধ,

আজ আমি বাকহারা। ...

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'আমাদের ভগৎ' বই থেকে নেয়া।